নাগলতা

সুবোধ ঘোষ

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১২

তৃতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
এস. স্কোয়ার

প্রচ্ছদ ব্লক
সিগনেট ফোটো টাইপ

ব্লক মুদ্রণ
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ

বাঁধাই
ইউনিয়ন বাইণ্ডিং

দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

এই লেখকের :

ফসিল
পরশুরামের কুঠার
শুক্লাভিসার
গ্রাম যমুনা
মণিকর্ণিকা
জতুগৃহ
মন ভ্রমরা
থির বিজুরী
পুতুলের চিঠি
তিলাঞ্জলী
একটি নমস্কারে
শতভিষা
গঙ্গোত্রী
ত্রিযামা
শ্রেয়সী
শুন বরনারী
মনোবাসিতা
গল্পলোক
ভোরের মালতী
কুসুমেষু
পলাশের নেশা
ভারত প্রেমকথা
কিংবদন্তীর দেশে
রূপসাগর
শতকিয়া
বর্ণালী
সীমন্ত সরণী
মীন পিয়াসী
জলকমল

একবার দেখলে অনেকবার মনে পড়বে; আর একদিন দেখলে অনেকদিন মনে থাকবে; এ রকম একটি চেহারা।

চোখ দুটি বেশ টানা-টানা; কিন্তু দুই চোখের কোল দুটো বেশ কুঁচকে গিয়েছে, এবং বোধহয় সেই জন্যেই মনে হয়, সব সময় হাসছে চোখ দুটো। তা ছাড়া, কাঁচা-পাকা এক জোড়া গোঁফও একটু শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে। তাই বোধহয় মনে হয়, যেন ঠোঁটের উপর একটা হাসির ছায়া লুটিয়ে পড়েছে।

বারো মাস ওই একই সাজ; খাকি কামিজ, খাকি হাফ-প্যান্ট আর খাকি মোজা। দু'পায়ে কালো চামড়ার এক জোড়া ভারি বুট। আর মাথায় একটা হ্যাট।

হ্যাটটা শোলার; কিন্তু মাঝে মাঝে খেজুর পাতার হ্যাটও তাঁকে পরতে দেখা যায়। এ জিনিসটা তাঁর নিজেরই হাতের কারুকলার একটি কীর্তি। কেউ শিখিয়ে দেয় নি, কারও কাছ থেকে দেখা-শেখা ব্যাপারও নয়। নিজেই ভেবে-চিন্তে, বার-বার পরীক্ষা করে, শুধু একটা পেন্সিল-কাটা ছুরির সাহায্যে তিনি খেজুর-পাতার হ্যাট তৈরি করে থাকেন।

একটা একনলা বন্দুক; সেটা কখনও পিঠের সঙ্গে আবার কখনও বা তাঁর সাইকেলের রডের সঙ্গে বাঁধা থাকে। ষাট বছর বয়স, তবু এই সেদিনও তিনি ষাট মাইল পথ সাইকেল চালিয়ে সেই কুলডিহা থেকে এই শিউলিবাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মাসটা ছিল আষাঢ়; সারা দিনে তিন পশলা জোর বৃষ্টিও হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সময়মত, অর্থাৎ সন্ধ্যার জোনাকি জ্বলে উঠতেই বাড়ির দরজার কাছে এসে সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে ডাক দিয়েছেন: আমি এসেছি নিরু।

লোকে জানে, প্রতিবেশীরাও শুনে আসছে, রোজই ঠিক সন্ধ্যার

সময় বাড়ি ফিরে, ঠিক এইরকম একটি স্বস্তিময় স্বরে, ঠিক এইভাবেই ঘন্টি বাজিয়ে ডাক দিয়ে থাকেন এই ভদ্রলোক ঃ আমি এসেছি নিরু।

ঘরে ভিতর থেকে লণ্ঠন হাতে দরজার কাছে এগিয়ে আসেন নিরুপমা। মাঝে মাঝে নিরুপমাকেও কথা বলতে শোনা যায়। যেন একটু বেশি খুশী হয়ে আর হেসে কথা বলছেন নিরুপমা।—এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে? এখনও তো জোনাকি জ্বলে নি।

ভদ্রলোক হাসেন ঃ আমি ঠিক সময়েই ফিরেছি। সন্ধ্যাটাই আসতে একটু দেরি করেছে।

সেই ভোজপুরী হালুয়াই রামসিংহাসন আজও বেঁচে আছে। রামসিংহাসন জানে, বাঙালীবাবু আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে এসে আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়েছেন, আর বউকে নাম ধরে ডেকেছেন।

আজকাল অর্থাৎ এই পাঁচ বছর ধরে বাঙালীবাবু কিন্তু মাঝে মাঝে অন্য একটা নাম ধরেও ডাকেন ঃ আমি এসেছি নন্দু।

ঘরের ভিতর থেকে লণ্ঠন হাতে নিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে আসে সুনন্দা। সুনন্দাকেও মাঝে মাঝে বলতে শোনা যায় ঃ আজ কিন্তু একটু দেরি করেছ বাবা।

রামসিংহাসন শুনতে পায়, বাঙালীবাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন ঃ আমার দেরি হয় নি নন্দু, সন্ধ্যাটাই একটু তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে গেছে।

রামসিংহাসনের বাড়িটা এমন কিছু দূরে নয়। বাঙালীবাবুর বাড়ি আর রামসিংহাসনের বাড়ি, মাঝখানে শুধু একটা পেঁপে বাগানের ব্যবধান।

এই শিউলিবাড়ির কে না চেনে বিজনবাবুকে? কিন্তু বিজনবাবু নামটাকে কেউ জানে বলে মনে হয় না। জানে শুধু তারা, যারা আজকাল মাঝে মাঝে এখানে কলকাতা থেকে হাওয়া বদলাতে আসে আর বিজনবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়ে নাম জিজ্ঞাসা করে।

বিজনবিহারী রায়, আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এখানে আছেন। এই রেল-লাইন আর এই শিউলিবাড়ি স্টেশনও যখন হয় নি, তখন থেকে তিনি এখানে আছেন। আর্থ-কাটিং অর্থাৎ মাটি-কাটার ঠিকেদারী করেন ভদ্রলোক। পাব্লিক ওয়ার্কসের, রেলের আর জেলা বোর্ডের যত কণ্ট্রাক্টর, আর মাটি-কাটা যত মজুর, সকলেই বিজনবাবুকে যে-নামে চেনে আর ডাকে, সেটা একটা অন্য নাম— মাটিসাহেব। পঞ্জাবী কণ্ট্রাক্টরেরা বলে—মিট্টিসাব।

মাটিসাহেব বিজনবাবুর খাকি-সাজের রঙ; তা-ছাড়া মুখটার, হাঁটু দুটোর আর কনুই থেকে আঙুল পর্যন্ত হাত দুটোরও রঙ, যদিও দেখতে মেটে-মেটে বলে মনে হবে, কিন্তু তাঁর কামিজের কলারটা একটু এলিয়ে পড়লেই দেখা যাবে, কী চমৎকার ফরসা একটা গায়ের রঙ খাকি কামিজের আড়ালে ধবধব করছে। কোন সন্দেহ নেই, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একটানা মাটি-কাটা ঠিকেদারীর জীবন, যত পাহাড়ী ডাঙ্গার ধুলো, শাল-জঙ্গলের হাওয়া আর বারো মাসের রোদ-জল-হিম বিজনবাবুর পরিশ্রমের শরীরটার যেটুকু ছুঁতে পেরেছে, সেটুকু মাটি-রঙ করে ছেড়েছে।

তিনি যখন এখানে এসেছিলেন, তখন এ-জায়গাটার কোন নামই ছিল না। পালামৌ জেলা বোর্ডের রাস্তাটা এখানে এসে রাঁচি যাবার সড়কটার সঙ্গে মিশেছে; তাই এখানে সড়কের পাশে শুধু একটা সরাই ছিল, একটা হালুয়াইয়েয় দোকান ছিল, আর মহুয়া চোলাই করবার একটা ভাঁটি ছিল। পঁয়ত্রিশ বছর আগে রেল লাইনের জন্য মাটি কাটবার ঠিকাদারী নিয়ে বিজনবাবু এখানে এসে সেই সরাইয়ের একটা ঘরে ঠাঁই নিয়েছিলেন। সরাইয়ের পিছনে একটা মহুয়ার নীচে সারা রাত ধরে দুই নেকড়ের মারামারি আর ঝগড়ার শব্দও শুনেছিল সেদিনের যুবক বিজনবিহারী।

কিন্তু সেজন্য জায়গাটার উপর একটুও রাগ করে নি বিজন-বিহারী; কোন ভয় নয়, একটু বিরক্তিও নয়। বরং, ঠিক একটি বছর পরে, সড়ক থেকে একটু দূরে মাঠের উপর কাঁচা-ইটের

দেওয়াল-দেওয়া একটি বাড়ি তৈরি করেছিল বিজনবিহারী। তারপর একদিন সেই বাড়িতে ঢুকে আর হেসে হেসে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলেছিল নিরুপমা।

চারদিকে জঙ্গল, কাছে ও দূরে ছোট-বড় পাহাড়, সড়ক দিয়ে সারা দিনে একবার মাত্র জোড়া উটের ডাকগাড়ি যায় আর আসে ; তা'ও সপ্তাহে তিন-চার দিন বাদ যায়। এহেন এক জগতে বাঙালী বিজনবিহারীর ওই কাঁচা-ইটের বাড়িটাই হল প্রথম গৃহস্থের বাড়ি ; যে-বাড়ির চারদিকে চারটে শিউলির চারাকে বিজনবিহারী নিজের হাতে রোপণ করেছিল ; আর বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনেক যত্নও করেছিল।

নিরুপমা হেসে হেসে বলেছিল, বাংলা দেশের শিউলি, এই পাথুরে মাটিতে বেঁচে থাকতে পারবে কি ?

—খুব পারবে। আমি পারিয়ে ছাড়ব। বাংলা দেশের শিউলি বলে নয়, সেদিনের পঁচিশ বছর বয়সের বিজনবিহারীর কাছে সে শিউলির আরও একটা মায়া ছিল। সে বড় অদ্ভুত মায়া।

কিছুদিন আগে সড়কের মোড়ে উটগাড়িটা চাকা ভেঙে আর বিকল হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ; আর একজন যাত্রী গাড়ি থেকে নেমে বিজনবিহারীর সঙ্গে আলাপ করছিল।—আমার নাম পীতাম্বর। বাড়ি কটক। সাসারামে সিংহ বাবুদের বাড়িতে মালীর কাজ করি।

এই পীতাম্বরের সঙ্গের একটা ঝুড়িতে এক গাদা চারা গাছ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল বিজনবিহারী, ওগুলি কী ?

—শিউলির চারা। বাংলা দেশের শিউলি। নেবেন কয়েকটা ?

—না।...আচ্ছা দাও।

নিরুপমাকেও বলতে ভুলে যান নি বিজনবিহারী, হঠাৎ মনে হল, বাংলা দেশের শিউলি মানে তুমি। তাই নিলাম। তা না হলে বাংলাদেশী জিনিস আমি ছুঁতামও না।

বিজনবিহারীর নিজের হাতের রোপা সেই শিউলিতে যেদিন ফুল ধরেছিল, সেদিন ভোজপুরী হালুয়াই রামসিংহাসন একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল, কওন ফুল বা ?

—শিউলি।

—শিহুলি ?

—নেহি নেহি, শিউলি বোলিয়ে।

—শিউলি ! শিউলি ! রামসিংহাসন বেশ খুশী হয়ে হেসেছিল।

কাঁচা ইটের সেই বাড়ির সামনে একটা কূয়ো কাটিয়েছিল বিজনবিহারী। ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটিয়ে কূয়ো কাটা ! বিজনবিহারী সেদিন সেই জংলী নিভৃতের শান্ত বুকটার ওপর যেন প্রচণ্ড এক বিস্ময়ের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। আট ক্রোশ দূর থেকে মুণ্ডা নরনারী আর ছেলে-মেয়ের দল সে দৃশ্য দেখতে এসেছিল ; যদিও রামসিংহাসন ভয় পেয়ে আর ঝাঁপ নামিয়ে দোকান বন্ধ করে দিয়ে তিন ক্রোশ দূরের একটা বুড়ো বটের কাছে গিয়ে বসে ছিল।

বিজনবিহারীর কূয়োর জলের সুনাম চারদিকে রটে যেতে বোধ হয় এক মাসেরও বেশি সময় লাগে নি। যেমন মিঠা তেমনই ঠাণ্ডা চমৎকার জল। প্রথম সার্ভিস বাসের ড্রাইভার সড়কের মোড়ে বাস থামিয়েই খালাসীকে ডাক দিত : চল জী, শিউলিবাড়ির কূয়োর জল খেয়ে আসি।

কেউ চেষ্টা করে নামটাকে তৈরি করে নি ; যেন মানুষের ভাষা নিজেরই খুশিতে মুখর হয়ে বাঙালী বিজনবিহারীর কাঁচা ইটের বাড়িটাকে শিউলিবাড়ি নাম দিয়ে ফেলেছিল।

দুটো বছর যেতে না যেতেই বিজনবিহারী দেখেছিল, বাস-সার্ভিসের টিকিটে একটা নতুন জায়গার নাম ছাপা হয়েছে—শিউলিবাড়ি।

তারও তিনটে বছর পরে যখন রেল লাইন হল আর স্টেশনটা তৈরি হল, তখন দেখা গেল, প্ল্যাটফর্মের উপর মস্ত বড় কাঠের

বোর্ডের উপর ইংরেজীতে স্টেশনের নামটা নতুন রঙে লেখা হয়ে ঝলমল করছে—শিউলিবাড়ি।

এই ইতিহাসটা জেলা গেজেটিয়ারে লেখা নেই ; কিন্তু এটা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্য একটা ইতিহাস। শিউলিবাড়ি নামটা এক মাটি-কাটা ঠিকেদারের, বাঙালী বিজনবিহারীর, আজকের এই মাটি-সাহেবেরই জীবনের একটা ঘটনার দান। তা না হলে, চারদিকের যত ডিহা-ডিহির মধ্যে একটা জায়গার নাম শিউলিবাড়ি হয়ে যেতে পারত না।

রাতের অন্ধকারে সড়কের মোড়ে দাঁড়িয়ে যখন কোন আদিবাসী ওঝা কিংবা মুখিয়ার সঙ্গে মুণ্ডারী ভাষায় গল্প করেন মাটি-সাহেব তখন কারও সন্দেহ করবারও সাধ্যি হয় না যে, বাঙালী বিজনবিহারী রায় কথা বলছেন। শুধু কথা নয়, মুণ্ডারী ভাষায় গানও গাইতে পারেন মাটিসাহেব। এই সেদিনও তাঁকে দেখতে পাওয়া গেছে, জেলা বোর্ডের কাঁচা সড়কের উপর গাছতলায় দাঁড়িয়ে মুণ্ডারী ভাষায় ছড়া কাটছেন, আর মাটি-কাটা মেয়ে-মজুরের দল হেসে লুটিয়ে পড়ছে।

আজকের শিউলিবাড়ির চেহারা দেখে কারও কল্পনা করবার সাধ্যি নেই যে, পঁয়ত্রিশ বছর আগে এখানে শুধু শাল জঙ্গলের ছায়ায় ঘেরা নিতান্ত দীনহীন একটা সড়কের মোড়ে ততোধিক দীনহীন তিনটে মাটির ঘর শুধু পড়ে ছিল। নেকড়ের উপদ্রবের জন্য দিনের বেলাতেও কোন গরুর গাড়ি এই পথে একলা যেতে সাহস পেত না। আজকের শিউলিবাড়িতে, স্টেশনের দিক থেকে এগিয়ে এসে সর্দার সুচেত সিং-এর সেগুনের আসবাবের প্রকাণ্ড দোকানটা পার হলেই অন্তত চারটে বেশ ভাল চেহারার স্টেশনারি দোকান দেখতে পাওয়া যাবে। আর তার পাশেই আছে পর পর তিনটে ফলের দোকান। চারদিকের যত কোলিয়ারির মালিক আর ম্যানেজারের গাড়ি, প্রতিদিন অন্তত আট-দশটা গাড়ি এখানেই আসে আর সওদা করে চলে যায়।

তাছাড়া, শিউলিবাড়ির দক্ষিণের গা ঘেঁষে চমৎকার চেহারার যত বাংলো গড়নের বাড়ি দেখা যায়, সেগুলির বেশির ভাগই বাঙালীর বাড়ি। অনেকদিন আগেই শিউলিবাড়ির জল-হাওয়ার সুনাম কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এমনিতেই নয়, এই মাটিসাহেবই রেল-বিভাগের অনেক বড়-বড় বাঙালী অফিসারকে বুঝিয়েছিলেন, আর তাঁদেরই দিয়ে শিউলিবাড়ির স্বাস্থ্যের গৌরব প্রচার করিয়েছিলেন। শীতের সময় এইসব বাড়ির কোনটাই খালি থাকে না। বাড়ির মালিকেরা নিজেরাও সপরিবারে আসেন; আবার চার-পাঁচ মাসের ভাড়াটে হয়েও অনেকে আসেন। সে-সময়ে এক-একদিন শিউলিবাড়ির শান্ত কুয়াশাভরা সন্ধ্যার বুকে যেন নতুন দীপালির আনন্দ মুখর হয়ে হেসে ওঠে। ছোট ছোট ছেলেরা একলব্য অভিনয় করে। আর, ত্রৈলোক্য-অপেরা এসে সুভদ্রাহরণ গেয়ে চলে যায়।

হাওয়া বদলাতে কলকাতা থেকে বাঙালীরা যাঁরা আসেন, শুধু তাঁরা নন, বদলি হয়ে স্টেশনের নতুন স্টাফ হয়ে বাঙালী কর্মচারী যাঁরা আসেন, তাঁরাও দেখে আশ্চর্য হয়ে থাকেন, শিউলিবাড়ির বাজারে কইমাছ কিনতে পাওয়া যায়। সে কইয়ের স্বাস্থ্যের তুলনায় যশোরের কইও রোগাটে। দামও অন্তত কলকাতার বাজারের চেয়ে কম গলা-কাটা। শিউলিবাড়ির চারদিকে ঝুমরা রাজ এস্টেটের যত ঝিল আছে, তার প্রায় সবগুলিই কইমাছে ভরে গিয়েছে।

আরও নানা বিস্ময়ের চেহারা শিউলিবাড়ির এই ছোট্ট বাজারেই দেখতে পাওয়া যাবে। হালুয়াই রামসিংহাসনের দোকানে সরপুরিয়া আর ক্ষীরমোহন পাওয়া যাবে। আদিবাসী মেয়েরাও ঝুড়ি-ভর্তি মুড়ির মোয়া নিয়ে বাজারের ভিতরে এক সারিতে বসে আছে। রাঁচির পাইকারের লোকজন চাঁপা কলার কাঁদি কেনবার জন্য এই শিউলিবাড়ির বাজারে এসে ভিড় করেছে; দশ বছর আগে ওরা শেওড়াফুলিতে যেত।

তিন দিকে পাহাড় আর প্রায় চারদিকেই জঙ্গল—বাংলা দেশ

থেকে এত দূরে একটা নিরালার বুকের যত কাঁকর আর পাথরের উপর কে যেন আলাদীনের প্রদীপের সেই অদ্ভুতকর্মা দাস-দানবটির মত শক্তিধর হয়ে বাংলা দেশের মাটির যত সাধ তুলে নিয়ে এসে ছড়িয়ে দিয়েছে।

অনেকেই জানেন, এই সব মাটিসাহেব বিজনবাবুর পঁয়ত্রিশ বছরের একটা একরোখা চেষ্টার কীর্তি। অনেকে শুনেছেন, ভদ্রলোক এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও এই শিউলিবাড়ি ছেড়ে থাকেন নি। হালুয়াই রামসিংহাসনও ভেবে পায় না, মাটিসাহেব কেন এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও নিজের দেশে গেল না ?

ফিকে সবুজ রঙের চেহারার যে শৌখিন বাড়িটার দরজায় বাঘ-ছালের পর্দা ঝুলছে, সেই বাড়ির মালিক মিস্টার দস্তিদার একদিন মাটিসাহেব বিজনবিহারী রায়কে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আর বেশ খুশী হয়ে গল্প করেছিলেন।—আপনাকে দেখলেই আমার স্যার সেসিল রোডসের জীবনের যত ঘটনার গল্প মনে পড়ে যায়। জঙ্গলের যত জংলীপনাকে মেরে-কেটে সরিয়ে আপনিও যে একটা উপনিবেশ তৈরি করে ফেলেছেন মশাই। শিউলিবাড়ি যে সত্যিই আপনার রোডেসিয়া। আপনি সত্যিই একজন ফার্স্টক্লাস অ্যাডভেঞ্চারার।

মাটিসাহেব যেন লজ্জিত হয়ে আর মাথা হেঁট করে হেসেছিলেন। কোনো কথা বলতে পারেন নি।

—শুনেছি, জুপলা পাহাড়ের উত্তরের ওই জঙ্গলের ভেতরে বলবলা নদীর প্রপাতটা আপনিই আবিষ্কার করেছিলেন।

মাটিসাহেব তাঁর পিঠের বন্দুকটাকে একবার কাঁধ ঝুলিয়ে একটা ঝাঁকানি নিয়ে বিনীতভাবে হেসেছিলেন : আমিই ওই সাংঘাতিক ঝর্ণাটাকে একদিন খুঁজে বের করেছিলাম। তাছাড়া, আপনাদের ওই দামোদরের উৎসটাকেও···

মিস্টার দস্তিদরের চোখ দুটো আরও খুশী হয়ে চমকে ওঠে—সেটাও কি আপনি খুঁজে বের করেছেন ?

মাটিসাহেবের চোখ দুটো ঝিকঝিক করে।—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিন দিন ধরে একাই হেঁটে হেঁটে, আর শুধু পাকা বটফল খেয়ে···। বলতে বলতে যেন আরও লজ্জিত হয়ে, শেষে নীরব হয়ে যান মাটিসাহেব।

মিস্টার দস্তিদার কিন্তু ছাড়েন না।—বলুন বলুন, থামলেন কেন?

—সে জায়গাটার নাম হল চুল্‌হাপানি। পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় ছোট্ট চূলোর মত একটা গর্তের উপর টুপ্‌ টুপ্‌ করে একটা চোরা ঝর্ণার জল ফাটা পাথরের ভেতর থেকে ঝরে পড়ছে। এই তো···আপনার ওই মহাদেব ঢোড়া, বোদা পাহাড় আর ধওরা পাহাড় পার হয়ে; ল্যাটারাইটের খাদান ছাড়িয়ে যে পাহাড়টা সেটারই প্রায় মাথার কাছে একটা বুড়ো পাকুড়ের পায়ের তলায় উৎসটা গুব্‌গুব্‌ করছে। ওদিকের দামোদরটার আমি একটা নামও দিয়েছিলাম স্যার।

—কি বললেন?

—হ্যাঁ স্যার, আমি নাম দিয়েছিলাম দেবনদ। ওদিকের গাঁয়ের লোক আজও কিন্তু এই নাম বলে থাকে স্যার; দমোদর বললে ওরা বুঝতে পারে না।

—খুব করেছেন! অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন! হেসে হেসে চেঁচিয়ে ওঠেন মিস্টার দস্তিদার।

—ডেপুটি কমিশনার হার্বাট সাহেব কিন্তু শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

—কি বললেন?

—দামোদরের উৎসের খবরটা আর জায়গাটার একটা ম্যাপ এঁকে আমি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু চেয়ারম্যানের ভাইপো রঘুবাবু আমাকে এসে বললেন, সাবধান, দামোদরের উৎস ওই চূল্‌হাপানি চূলহামে যায়; আপনি এসব ব্যাপার নিয়ে কখ্‌খনো লেখালিখি করবেন না।

মিস্টার দস্তিদার আশ্চর্য হনঃ কেন? এরকম ভয় দেখাবার মানে কি?

মাটিসাহেব হাসেন ঃ হার্বাট সাহেব চেয়ারম্যানকে জানিয়েছিলেন, আমার ঠিক পনের দিন আগে তিনিই দামোদরের উৎসটা আবিষ্কার করেছেন।

মিস্টার দস্তিদারও হেসে ফেলেন।

আর-একবার, সে বছর এখানে হাওয়া বদলাতে কলকাতা থেকে এসেছিলেন প্রফেসর বিনোদ দত্ত। তিনিও একদিন আশ্চর্য হয়ে মাটিসাহেব বিজনবাবুকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

প্রফেসর বিনোদ দত্ত বললেন, আপনাকে দেখলে আমার সত্যিই সেই পিলগ্রিম ফাদারদের কথা মনে পড়ে। দুঃসাহসে আপনিও কম যান না মশাই। তাছাড়া, এ তো আর অ্যাডভেঞ্চারারদের মত শুধু কাটাকাটি করবার দুঃসাহস নয়। আপনি সেই পিলগ্রিম ফাদারদেরই মত জঙ্গল সরিয়ে সেখানে দেশের যত ফুল ফুটিয়েছেন, ফল ফলিয়েছেন। আপনাকে হাজার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে মশাই।

মাটিসাহেব তাঁর সেই অদ্ভুত নম্রতার ভঙ্গিতে লজ্জিত হয়ে আর মৃদুভাবে হেসে, মাথা হেঁট করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেন।

প্রফেসর বিনোদ দত্ত যেন মুগ্ধ হয়ে বলেন, আপনি নাকি জঙ্গলের গাঁয়ে বাংলা ভাষা-টাষাও চালাতে চেষ্টা করেছেন।

—ভাষা নয় স্যার, একটা গান চালিয়েছিলাম।

—কিসের গান ?

—বাংলা গান।

—কি গান ?

—হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল।

—বলেন কি ? এ-গান এখানে চলেছে ?

—হ্যাঁ স্যার। রাতু চিলোয়া আর মুরি পাহাড়ের মুণ্ডাদের আর ওরাওঁদের ছেলে-মেয়েরাও এ-গান গাইতে পারে।

প্রফেসর বিনোদ দত্ত যেন মুগ্ধ হয়ে মাটিসাহেব বিজনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।—আপনি একটা অলৌকিক কাণ্ড সম্ভব করেছেন। ধন্যবাদ আপনাকে, হাজার ধন্যবাদ।

কিন্তু আজ এই সাত দিন হল কলকাতা থেকে হাওয়া বদলাতে এসেছেন যিনি, রিটায়ার্ড হেডমাস্টার করালীবাবু, তিনি আজ মাটিসাহেব বিজনবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই নাক কাঁপিয়ে একটা অদ্ভুত হাসি হেসেছেন।

মাটিসাহেব বিজনবাবু কিন্তু তাঁর স্বভাবসুলভ সেই লজ্জিত হাসিটাকেই আরও নরম করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি নতুন এসেছেন বলে মনে হচ্ছে স্যার ?

—হ্যাঁ, আমি নতুন এসেছি, আর আপনার নামও শুনেছি। কিন্তু চিনতেও পেরেছি।

—আজ্ঞে ?

করালীবাবু হাসেন ঃ আপনি তো একজন মিউটিনিয়ার।

—আজ্ঞে ?

—বুঝলেন না ?

—আজ্ঞে না।

—মিউটিনি…অর্থাৎ মস্ত একটা বিদ্রোহের কাণ্ড করেছেন, আর সেই জন্যে ইচ্ছে করে এখানে এসে একটা বনবাস খুঁজে নিয়েছেন। নয় কি ?

মাটিসাহেবের লাজুক হাসির মুখটা সেই মুহূর্তে শোকার্তের মুখের মত করুণ বিষাদে ভরে যায়।

পঁয়ত্রিশ বছর ধরে রোজ সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়েছেন যিনি, সেই মাটিসাহেব বিজন-বিহারী রায় আজ সন্ধ্যা হতে ঘরে ফিরেও দরজার সামনে যেন হতভম্বের মত থমকে দাঁড়িয়েছেন ; ঘণ্টি বাজাতেই ভুলে গিয়েছেন। ঘণ্টি বাজাবার শক্তিটাও যেন হঠাৎ অলস হয়ে হাতটাকে অলস করে দিয়েছে।

আস্তে আস্তে ডাকেন মাটিসাহেব ঃ আমি এসেছি নিরু।

পেঁপে বাগানের ওদিকে নিজের ঘরের দাওয়ার উপর বসে বুড়ো রামসিংহাসনও শুনে আশ্চর্য হয় ; এ কী রকমের উদাসীর মত ভাঙা

গলায় আস্তে আস্তে, যেন ক্লান্ত শ্রান্ত হতাশ মানুষের মত কুণ্ঠিতভাবে ডাক দিচ্ছেন মাটিসাহেব ? মাটিসাহেব আজ কি একটা জ্বর-জ্বালা নিয়ে ঘরে ফিরেছেন ? এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে মাটিসাহেবকে একদিনের জন্যেও তো কোন অসুখে ভুগতে দেখে নি রামসিংহাসন।

লণ্ঠন হাতে দরজার কাছে এগিয়ে এসেই চমকে ওঠেন নিরুপমা। এ কি ? চিরকেলে দুঃসাহসের মানুষটার মুখের উপর আজ এ কোন হতাশ সন্ধ্যার অন্ধকার থমথম করছে ? সেই যে পঁচিশ বছর আগে এক মাঝরাতে থানার লোক বাঁশের ডুলিতে বয়ে নিয়ে বিজন-বিহারীকে যখন বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, তখনও তো বিজন-বিহারীর মুখে একফোঁটা আতঙ্কের চিহ্ন দেখতে পান নি নিরুপমা। ভালুকটার ভয়ানক থাবার নখ বিজনবিহারীর পিঠটাকে তিন জায়গায় আঁচড়ে দিয়ে মাংস উপড়ে নিয়েছিল। সেই রক্তাক্ত যন্ত্রণার মধ্যেও নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে পেরেছিল যে বিজনবিহারী, সে আজ এত বিষণ্ণ আর এত গম্ভীর কেন ?

চেঁচিয়ে ওঠেন নিরুপমা : কি হল ? ওরকম করে তাকিয়ে আছ কেন ?

ছুটে আসে সুনন্দা : একি বাবা ? কি হয়েছে ? অসুখ করল নাকি ?

বিজনবিহারী হাসতে চেষ্টা করেন : না, কিছু না।

ঘরে ঢুকেই কিন্তু ক্লান্তভাবে বিড় বিড় করেন বিজনবিহারী : একটু একলা হয়ে কিছুক্ষণ বারান্দার উপর বসি। খাবার-টাবার একটু পরে দিস নন্দু, লণ্ঠনটাকে সরিয়ে নিয়ে যা।

॥ দুই ॥

একলা হয়ে বসে থাকলেই তো সব কথা মনে পড়ে যায়। আজ যেন ইচ্ছে করেই সে-সব কথা মনে করবার জন্যে একটু একলা হয়ে বসে থাকতে চেয়েছেন বিজনবিহারী।

মাকে একটুও মনে পড়ে না। কিন্তু বাবাকে খুবই ভাল করে মনে পড়ে। পনের বছর বয়সের ধাড়ি ছেলে হয়েও যে-ছেলে বাবাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে লৌহভীমচূর্ণ খেলেছে, সে কি করে বাবার মুখের সেই আহ্লাদের হাসির ছবিটা ভুলে যেতে পারবে, সে-ছেলে যদিও আজ ষাট বছর বয়সের এক মাটিসাহেব ?

বাবা শুধু যে নায়েবী করেই জীবন কাটিয়েছিলেন তা নয়; এককালে খুব ভাল কুস্তি লড়তেন। বাবার মাথাটা তাই সাদা হয়ে গেলেও বুকটা টান ছিল, আর হাত দুটোর মাস্‌ল্‌ও কত মজবুত ছিল। প্রাণপণ জোরে বাবার হাতের গুলি টিপেও সেই শক্ত মাংসপেশীর গর্ব একটুও খর্ব করা যেত না ; বিজন নিজেই হাঁপিয়ে পড়ত। বাবা হাসতেন : বৃথা চেষ্টা বিজু ; তোর সাধ্যি নেই। জিমন্যাস্টিকের মাস্টার তোর ওই মেজমামাও যে হার মেনে যায়।

মামাদের বাড়িটাও কেষ্টনগর থেকে বেশি দূরে নয়। দিগনগর যেতে পথের উপরেই নোনা আতার আর কামরাঙার বাগান দিয়ে ঘেরা সেই মামাবাড়িতে যখন-তখন চলে যেতে আর থেকে আসতে কোন বাধা নেই। বাবাই বলেন, যা বিজু, লক্ষ্মীপুজোর দিনটা মামাবাড়িতে গিয়ে পেট ভরে নারকেল নাড়ু খেয়ে চলে আয়।

বিজুরও আপত্তি নেই। মামাবাড়িটা এত কাছে যে, এক দৌড়ে পৌছে গিয়েও হাঁপাতে হয় না। দেরিও করে না বিজু, লক্ষ্মীপুজোর আগের দিনেই বিকালে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে, আর ব্যস্তভাবে দুটো মুড়ি চিবিয়ে নিয়েই মামাবাড়ির দিকে দৌড় দেয়। আর, শুধু

নারকেলের নাড়ু নয়, কাঁচা-পাকা কামরাঙাও পেট ভরে খেয়ে নিয়ে লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন বাড়ি ফিরে আসে।

বাবা বলেন, দৌড়ে গিয়েছিলি, না হেঁটে হেঁটে ?

—একদমে দৌড়ে গিয়েছিলাম।

—বহুৎ আচ্ছা। পেট ভরে কামরাঙা খেয়েছিস তো ?

—খেয়েছি বাবা।

—বহুৎ আচ্ছা। হ্যাঁ, পরীক্ষাটা পার হয়ে যাক্, তারপর দেখব, সাঁতার দিয়ে জলঙ্গী পার হতে তোর ক'মিনিট লাগে ?

মেজমামা বড় কড়া মেজাজের মানুষ। কিন্তু কি আশ্চর্য, বিজুকে গাছ উজাড় করে কামরাঙা খেতে দেখেও কিছু বলেন নি, যদিও চোখ পাকিয়ে অনেকক্ষণ বিজুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সন্দেহ হয় বিজুর, মেজমামা বোধ হয় বাবার দু'হাতের মাস্‌ল্-এর চেহারাটা স্মরণ করে বিজুকে কোন কড়া কথা বলেন না। সন্দেহ কেন, মাঝে মাঝে বেশ বুঝতেও পারে বিজু, বাবাকে বেশ ভয় করেন মামারা। বিজুকে আদর করে দুটো কথা বলতে যেন বুক ফেটে যায় মামাদের ; কিন্তু অনাদর করবারও সাহস পান না। মেজমামা একদিন অবশ্য বেশ সাহস করে আর রাগ করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন ঃ এটাকে বারান্দায় আসন পেতে খাবার জায়গা করে দাও ছোট বউমা।

বিজুও চেঁচিয়ে ওঠে।—বারান্দায় কেন ?

—হ্যাঁ।

—না ; আমি রান্নাঘরের ভেতরেই বসে খাব।

তখুনি রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠেছিল বিজু, আমাকে শিগগির ভাত দাও ছোট মামী।

এত কড়া রকমের রাগ করেও মেজমামার চড়া মেজাজ যেন ফস্‌ করে দমে গেল। বোধহয় বুঝতে পেরেছেন, পনের বছরের ঢেঁকি হয়েও যে অছেরে ছেলে এখনও বাপের সঙ্গে এক থালায় ভাত খায়, সে ছেলেকে একেবারে ঘরের বাইরে একটা বারান্দায় পাত পেড়ে ভাত খাওয়াবার সাহসটা ভাল সাহস নয়।

বড়দা আর মেজদার মেজাজ অনেকটা মামাদেরই মেজাজের মত। বড়দা থাকেন জলপাইগুড়িতে, আর মেজদা ডিব্রুগড়ে। দুজনেই সরকারী চাকরি করেন। বড়দা ডাক্তার, মেজদা অ্যাকাউন্টেন্ট। পূজোর ছুটিতে বড়দা আর মেজদা বাড়িতে এসে যে-কটা দিন থাকেন, সে-কটা দিন বিজুর মুখের দিকে দুজনেই যেন যখন-তখন গম্ভীরভাবে তাকান। দশমীর সন্ধ্যাতে বিজু যখন হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে বড়দা আর মেজদাকে প্রণাম করে, তখনও কেমন যেন কাঠ-কাঠ একটা চেহারা ধরে আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন দুই দাদা; একটা কথাও বলেন না। বিজুর মাথায় একবার হাতটাও রাখেন না।

ছোড়দা কিন্তু একেবারে উল্টো মেজাজের মানুষ। ছোড়দা অনেকবার ফেল করে এখনও বি-এ পড়ছেন, দিন-রাত পড়তে আর লিখতেই ভালবাসেন ছোড়দা। আর ভালবাসেন বিজুর সঙ্গে গল্প করতে। বিজুর জামা কবে ছিঁড়ে গেল, আর দুটো নতুন প্যান্ট না হলে যে চলে না; এসব খবর ছোড়দাই রাখেন। ছোড়দা নিজেই বিজুকে সঙ্গে নিয়ে কাপড় কিনতে যান, দরজির দোকানে গিয়ে জামার ছাঁটের রকম-সকম দরজিকে ভাল করে বুঝিয়ে দেন।

প্রতি রবিবার ছোড়দা নিজের হাতে বিজুর গায়ে সাবান ঘষে ঘষে যেন বিজুর সাত দিনের মাটিমাখা দুরন্তপনার সব ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন। বাড়ির ঠাকুরও হাসতে থাকে। এরকম একটা ধাড়ি বয়সের ভাইকে এত যত্ন করতে কোনও বাড়ির কোন দাদাকে দেখে নি ঠাকুর।

ছোড়দার সঙ্গে এক বিছানায় না শুতে পেলে বিজুরও ঘুম হয় না। যদি কোন দিন বাবার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হয়েছে, বিজুর আত্মাটাই যেন হাই তুলে আর এপাশ-ওপাশ করে বিনা ঘুমে ছটফট করেছে। বাবা বলেন, যা, কমলের কাছে গিয়ে শুয়ে থাক্। কমলের গায়ের গন্ধ ছাড়া তোর ঘুম হবে না।

এক লাফে বাবার বিছানা ছেড়ে দিয়ে ছোড়দার বিছানায় উঠে

আর ছোড়দার পিঠের কাছে মুখটা গুঁজে দিয়ে শুয়ে পড়ে বিজু। আঃ, সত্যিই কি চমৎকার আরামের ঘুম। চোখের পাতা জড়িয়ে ধরছে। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে; থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিকও ফুটে উঠছে, আর ঝড়ো বাতাসের শব্দটাও বেশ শনশনে। একটু শীত-শীতও করছে।

ছোড়দার প্রাণটাও যেন থার্মোমিটারের মত একটা যন্ত্র। চট্‌ করে বুঝে নিতে পারে, বিজুর গায়ের তাপ বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। তা না হলে, তখুনি ধড়ফড় করে জেগে উঠে আর পায়ের কাছে রাখা চাদরটাকে টেনে বিজুর গায়ে জড়িয়ে দেবেন কেন?

বড়দি আছেন এলাহাবাদে। বড় জামাইবাবু নাকি মস্ত নামজাদা উকিল। কিন্তু বড়দিকে আজও চোখে দেখে নি বিজু। ছোড়দা বলেন, অনেকদিন আগে, তুই যখন ছোট্ট, তখন বড়দি একদিনের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু এক রাত্রিও থাকেন নি।

—কেন ছোড়দা?

—বড় জামাইবাবু বড়দিকে থাকতে দেন নি। বড়দি খুব কেঁদেছিলেন।

—কেন ছোড়দা?

– বাবার উপর বড় জামাইবাবুর খুব রাগ ছিল।

বিজু বলে, আমি তখন যদি একটু বড় থাকতাম, তবে বড় জামাইবাবুকে বুঝিয়ে দিতাম।

ছোড়দা বলেন, চুপ কর।

বিজু বলে, বড়দা আর মেজদাও নাকি বাবার উপর রাগ করে বিয়ে করলেন না।

—জানি না।

—তুমি নিশ্চয় বিয়ে করবে, ছোড়দা?

—নিশ্চয়।

মেজদির শ্বশুরবাড়িটা কিন্তু মন্দ নয়। কথা ছিল, এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার পর বিজু গিয়ে মেজদির বাড়িতে তিনটে মাস থেকে আসবে। কিন্তু ওপরের ক্লাসেই উঠতে পারা গেল না; এনট্রান্স

পরীক্ষাটা কপালে আছে কিনা, তাও ভগবান জানেন। এত অপেক্ষা সহ্য হয় না। বিজু তাই এই এক বছরের মধ্যে তিনবার মেজদির শ্বশুরবাড়িতে বেড়িয়ে এসেছে।

মামাবাড়ির মত মেজদির শ্বশুরবাড়িটা অবশ্য কেষ্টনগরের এত কাছে নয়; আবার বড়দির শ্বশুরবাড়ির মত অত দূরেও নয়। মানকর ছাড়িয়ে মাইল দুই হাঁটা দিলেই মানিকপুরের বাবুদের একটা কাছারি বাড়িতে পৌঁছনো যায়। জায়গাটার নাম শিবপুকুর। সরকার মশাই বটুকবাবুও বেশ ভাল লোক। কিছুই বলতে কইতে হয় না, বটুকবাবু নিজেই একটা গো-গাড়ি ডেকে আনেন; আর বিজু সেই গো-গাড়ির ভিতরে চুপ করে বসে, ঝিমতে ঝিমতে আর ঘুমতে ঘুমতে আট ক্রোশ দূরের মানিকপুরে পৌঁছে যায়।

মেজ জামাইবাবু খুব বড় জমিদার। মেজদিদের বাড়িটাও বিরাট। ছাদটা এত বড় যে, ফুটবল খেলতে পারা যায়। কিন্তু খেলবার উপায় নেই। হাজার হাজার কবুতরের ভিড়ে ছাদটা সব সময় ছেয়ে আছে; আর কী অদ্ভুত বকম-বকম আওয়াজের ঝড়!

মেজদি সাবধান করে দেন, ছাদে যাস নি বিজু। মানিকপুরের পায়রা ভয়ানক হিংসুটে; নাক-চোখ ঠুকরে দেবে।

—ইস্, সাধ্যি কী? ছোলাখেকো কবুতর আমাকে ঠুকরোবে?

সিঁড়ি ধরে এক দৌড়ে ছাদে উঠে আর একটা বাখারি দুলিয়ে সারাটা বেলা কবুতরগুলিকে উত্যক্ত করে, ভয় দেখিয়ে অতিষ্ঠ করে আর উড়িয়ে উড়িয়ে ক্লান্ত করে তোলে বিজু, তবু নিজে একটুও ক্লান্ত হয় না।

মেজদি বিজুর চেয়ে দশ বছরের আর ছোড়দার চেয়ে দু'বছরের বড়। প্রায় দশ বছর হল, মেজদির বিয়ে হয়েছে; কিন্তু এখনও চেষ্টা করলে মনে মনে দেখতে পায় বিজু, ঘুমভরা চোখে চাঁদের দিকে তাকালে যে-রকমের ছবি চোখের উপর ভেসে ওঠে, যেন সেই রকমের একটা ছবি। মেজদির যেদিন বিয়ে হয়ে গেল, তার পরের দিন ঝকঝকে বেনারসী শাড়িতে সেজে, টায়রাপরা কপালের উপর

ঘোমটাটি টেনে দিয়ে আর হেসে হেসে শ্বশুরবাড়ি রওনা হবার জন্য মেজদি গাড়িটার দিকে এক পা এগিয়ে গিয়েই কি ভয়ানক ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। বিজুর গলা জড়িয়ে ধরে পুরো পাঁচটা মিনিট এক ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মেজদি। বিজুও মেজদির শাড়ির আঁচলটা শক্ত করে ধরে রেখেছিল।

কে জানে কেন, মেজদির সেই কান্না, আর বিজুর গলা জড়িয়ে-ধরা-মায়ার কাণ্ডটা দেখেও মেজ জামাইবাবু যেন ঠোঁট চেপে একটা অদ্ভুত হাসি হেসেছিলেন। মেজমামা তো চোখ পাকিয়েই দেখছিলেন। শুধু বাবা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে মেজদির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন; আর বিজুর একটা হাত ধরে বললেন, মেজদিকে যেতে দাও বিজু; তুমি আমার কাছে এস।

মানিকপুরে মেজদির বাড়িতে যতবার এসেছে বিজু, ততবার বিজুকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছেন মেজ জামাইবাবু, দেখে যাও রমা, তোমার অদ্ভুত ভাইটি এসেছে।

মেজ জামাইবাবুর এই চেঁচানো খুশীর ভাষাটা শুনতে একটুও ভাল লাগে না বিজুর। একদিন মেজদিকেই আচমকা জিজ্ঞাসা করে বসে, মেজ জামাইবাবু আমাকে তোমার অদ্ভুত ভাই বলেন কেন? কথাটার মানে কি?

মেজদির মুখটা হঠাৎ যেন করুণ হয়ে যায়।—ওটা একটা কথার কথা।

—বাংলাতে ফেল করলেও আমি বাংলা ভাষা একটু বুঝি মেজদি। অদ্ভুত মানে তো কুৎসিত।

মেজদি হেসে ফেলেন: তোমাকে কুৎসিত বলে মনে করবে কার মনের এত সাধ্যি আছে? খুঁজে বের করুক দেখি তোমার জামাইবাবু সারা মানিকপুরে এরকম ফরসা রঙটি, এরকম টানা-টানা চোখ দুটি? এরকম ঢলঢলে সুন্দর মুখটি কোন ছেলের আছে?

বিজুও হেসে ফেলে: তবে ওকথা বলেন কেন জামাইবাবু?

—সেই জন্যেই বলেন। অদ্ভুত ভাইটি মানে সুন্দর ভাইটি!

॥ তিন ॥

মানিকপুরে মেজদির বাড়িতে এই এক বছরের মধ্যে তিনবার বেড়াতে গিয়ে মাঝপথের আর-একটা বাড়িকেও খুব ভাল লেগে গিয়েছে। শিবপুকুরের সেই কাছারি বাড়ির সরকার মশাই বটুক-বাবুর বাড়িটা।

সত্যিই একটা পুরনো শিবমন্দির আছে; আর সেই শিবমন্দিরের সামনে একটা পুকুরও আছে। পুরনো মন্দিরটার এক দিকে কাছারি-বাড়ি, আর অন্য দিকে সরকার মশাই বটুকবাবুর বাড়ি।

নিতান্ত একটা মাটির বাড়ি। চালাটা টিনের। প্রথম যে-বার মানিকপুর যাবার সময় মানকর স্টেশন থেকে হাঁটা দিয়ে এই কাছারি-বাড়িতে এসে উঠেছিল বিজু, সে-বারই বটুকবাবুর বাড়ি থেকে এসে বিজুকে প্রথম অভ্যর্থনা করে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল যে, সে হল বটুকবাবুর মেয়ে, নাম কাজলী, বয়সটা দশ বছরের বেশি হবে না।

কাজলীর মা বেশ যত্ন করে বিজুকে কদমা, ক্ষীর আর মুড়ি খাইয়েছিলেন। জলের গেলাসটা কাজলীই নিয়ে এসে বিজুর হাতে তুলে দিয়েছিল।

যতক্ষণ গো-গাড়ি আসে নি ততক্ষণ কাজলীর সঙ্গেই গল্প করেছিল বিজু।

বিজু বলে, কাজলী আবার কেমন নাম? কাজলী তো এক-রকমের ধানের নাম। শুনতে একটুও ভাল লাগে না।

কাজলী বলে, ভাল না লাগে তো বলো না। আমার নাম ডাকতে তোমাকে বলছে কে?

এর পরেও তো আরও পাঁচবার শিবপুকুরের কাছারি বাড়িতে আসতে হয়েছে বিজুকে। মানিকপুরে যাবার সময় দুবার, আর ফেরবার সময় তিনবার। দ্বিতীয়বার, তার মানে সেই প্রথমবারই

মানিকপুর থেকে ফেরবার পথে গো-গাড়িটা কাছারি বাড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই কাজলী ছুটে এসে বলে, আজ কিন্তু ভাত খেতে হবে।

—নিশ্চয় খাব। বিজুও গো-গাড়ি থেকে একটা লাফ দিয়ে নেমে পড়েই হেসে ওঠে।

কাজলী বলে, কিন্তু রান্না শেষ হতে একটু দেরি হবে।

—হোক না। ভালই তো।

কাজলীদের বাড়ির সবই ভাল, বিজুর প্রাণটা যেন এরই মধ্যে টের পেয়ে গিয়েছে। কাজলীর বাবা আর মা, কাজলীদের বাড়ির কদমা, ক্ষীর আর মুড়ি, সবই ভাল।

উঠোনের বেলগাছটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে বিজু, এ বেলগুলো পাকে না?

কাজলী হাসে ঃ পাকে বইকি? বোশেখ মাস পড়লেই পাকবে।

—এটা কি মাস?

—এটা তো ফাগুন।

চুপ করে কি যেন ভাবে বিজু। কিন্তু কাজলীই যেন বিজুর সেই ভাবনাটাকে চমকে দেয়।—বোশেখ মাসে আসবে তো আবার?

—কি বললে?

—বোশেখ মাসে এলে কিন্তু পাকা বেল খেতে পাবে।

—আসব।

বোশেখ মাস আসতে দেরি করে নি। বিজুও মানিকপুরে মেজদির বাড়িতে আর একবার বেড়িয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেরি করে নি।

কাজলীও দেখা হওয়া মাত্র বিজুকে বলে দিতে দেরি করে নি—অনেক বেল পেকেছে।

—ছিঃ, সত্যিই কি পাকা বেল খাবার লোভে আমি এসেছি?

—তবে কেন এসেছ?

—এসেছি তোমার বাবা আর মার সঙ্গে একবার দেখা করতে।

—দেখা কর তাহলে।

—করবই তো। কিন্তু সেজন্য তুমি ছটফট করছ কেন? আমার যখন ইচ্ছে হবে তখন দেখা করব।

—তবে এখন কি করবে?

—চল, তোমাদের হাঁসের ঘর আগে দেখে আসি।

শুধু হাঁসের ঘর দেখে নয়, কাজলীর সঙ্গে গল্প করে করে আর বেড়িয়ে আরও অনেক বিস্ময়ের জিনিস দেখে নেয় বিজু। মন্দিরের পিছনে একটা পুরনো চাঁপা গাছ আছে, একশো বছর বয়স। ওটার নাম গৌরীচাঁপা।

বিজু বলে, আশ্চর্য! মহাদেবের বউ গৌরী এই গাছটাকে পুঁতেছিল নাকি?

—কে জানে?

কুমোরের চাক ঘুরছে, আর নরম মাটির তাল চেপে ধরে দু-হাতের কায়দায় হাঁড়ি সরা আর কুঁজো গড়ছে কুমোরেরা, কাজলীর সঙ্গে কুমোর-পাড়াতে গিয়ে এই দৃশ্যও দেখে আসে বিজু।

কাজলী বলে, দেখলে তো! আর কখনও দেখেছ?

বিজু হাসেঃ কেষ্টনগরের ছেলেকে মাটির কারিগরীর গর্ব দেখাচ্ছ তুমি? মনে করেছ, আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি? আমাদের কেষ্টনগরের কুমোরদের কাছে তোমাদের এই শিবপুকুরের কুমোরেরা যে আঁতুড়ে শিশু।

মেজদি বলেছেন, অ্যানুয়াল পরীক্ষাটা এগিয়ে এসেছে; কাজেই এখন আর এত ঘন ঘন এখানে বেড়াতে আসিস না বিজু। মন দিয়ে পড়াশোনা কর, পরীক্ষাটা দিয়ে নে, তারপর আবার আসিস।

ছোড়দাও বাবার সঙ্গে তর্ক করেছে, বিজুকে আপনি যখন-তখন মানিকপুরে যেতে দিচ্ছেন কেন? তিন মাসের মধ্যে দু-বার তো গেল। আবার যাব-যাব করছে।

বাবা বলেন, যাক না।

—তা ছাড়া এভাবে একা-একা ট্রেনে চেপে ছুটোছুটি করাও এই বয়সের ছেলের পক্ষে একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। পথে বিপদ-আপদ তো লেগেই আছে।

বাবা বলেন, এখন থেকেই ট্রেনিং নিক। একটু বিপদে-আপদে পড়তে অভ্যেস করুক।

ছোড়দা জানেন, বাবাকে আর বেশি বুঝিয়ে বললেও কোন লাভ হবে না। তিনি বুঝবেনই না। বাবা এই সেদিনও, বর্ষার জলঙ্গী সাঁতরে পার হবার জন্য বিজুকে যেভাবে উৎসাহিত করেছিলেন, দেখে খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন ছোড়দা। ভাগ্যি ভাল, বাবা আর জেদ করেন নি। বিজুও বোধহয় মানিকপুরে যাবার ব্যাকুলতায় বর্ষার জলঙ্গী সাঁতারাবার লোভটাকে আপাতত ভুলে বসে আছে।

কিন্তু উপায় নেই; বিজুকে বলেও কোন লাভ হল না। আবার মানিকপুরে চলে গেল বিজু। এবার ঘুড়ি-নাটাইও সঙ্গে নিয়ে গেল। বাবা নিজেই হেসে চেঁচিয়ে বিজুকে উপদেশ দিলেন: মানিকপুরের সব ঘুড়ি এক এক গোঁত্তায় বো-কাট্টা করে ফিরে আসা চাই।

আবার শিবপুকুর। আবার কাজলী।

ঘুড়ি-নাটাই দেখে খিল খিল করে হেসে ওঠে কাজলী: ছিঃ, একেবারে ছেলেমানুষের মত কাণ্ড!

—কি বললে?

—আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরতে পারব না।

—ঘুরতে হবে।

—না। তুমি ঘুড়ি উড়োবে, তোমার সঙ্গে থেকে আমার লাভ কি?

—আমার তো লাভ আছে।

—ছাই লাভ।

—সত্যি বলছি, তুমি সঙ্গে থাকলে খুব ভাল লাগে।

—কেন ?

—তুমি তো তোমার মা'র চেয়েও সুন্দর।

কাজলী ভ্রুকুটি করে তাকায়।—মাকে বলে দেব ?

—যাও, এখনি গিয়ে বলে দাও। আচ্ছা, আমিই গিয়ে বলে দিচ্ছি। কেষ্টনগরের ছেলেকে তুমি ভয় দেখাতে এসেছ ?

—আচ্ছা, আর বলব না।

—কি বলবে না ?

—কারও কাছে কোন কথা বলব না।

—বাস, তবে চুপটি করে এস আমার সঙ্গে।

—না।

—কেন ?

—ভাল লাগছে না।

—তবে আমারও তোমাকে ভাল লাগছে না। ঘরে যাও তুমি।

বিজু একাই ঘুড়ি-নাটাই নিয়ে চলে যেতে থাকে। কাজলী বলে, রাগ করে চলে যাচ্ছ ; কিন্তু মনে থাকে যেন···।

—কি মনে থাকবে ?

—আমি ছাড়া তোমার গতি নেই।

বিজুর হুঙ্কার শোনবার অপেক্ষায় আর দাঁড়িয়ে থাকে না কাজলী। দৌড় দিয়ে বাড়ির দিকে চলে যায়।

আর বিজু চলে যায় ধানক্ষেতের দিকে। আলের উপর দাঁড়িয়ে ফুরফুরে হাওয়াতে ঘুড়ি ভাসিয়ে দিয়ে আর নাটাই দুলিয়ে সুতো ছাড়তে থাকে।

কিন্তু বোধহয় আধঘণ্টাও পার হয় নি, নাটাই গুটিয়ে নিয়ে আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে, কাজলীদের বাড়ির কাছে এসে কাটা তালগাছটার ধড়ের উপর চুপ করে বসে থাকে বিজু।

ছুটে আসে কাজলী : কি হল ?

—একটা গর্তের মধ্যে পা পড়ে গিয়েছিল। পা'টা বেশ মচকে গিয়েছে।

—খুব ব্যথা করছে?

—সে আর বলতে?

—তাহলে? কি করব বল?

—একটু বাটা হলুদ গরম করে আর একটু চুন নিয়ে চলে এস। কিন্তু খুব সাবধান, মাসিমা যেন টের না পান।

—মা টের পেলেই তো ভাল। তাড়াতাড়ি চুন-হলুদ গরম করে…।

—না, কখ্‌খনো না। মাসীমা তাহলে আমাকে খুব অপছন্দ করে ফেলবেন।

কাজলীও সত্যিই চুপি চুপি একটা সরাতে গরম চুন-হলুদ নিয়ে ফিরে আসে। পায়ের পাতার ওপর আর গিঁটের চারদিকে চুন-হলুদ লাগিয়ে নিয়ে আর হেসে হেসে কাজলীর মুখের দিকে তাকাতে গিয়েই বিজুর পনের বছর বয়সের দুরন্ত চোখে দুটো যেন চমকে ওঠে। জীবনে এই যেন প্রথম একটা বিস্ময়কে দু'চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছে বিজু। কাজলীর চোখ দুটো ছলছল করছে।

—কি হল?

—বলেছিলাম না, আমি ছাড়া তোমার কোন গতি নেই। কে চুন-হলুদ এনে দিল?

গল্পটা মেজদিকে না শুনিয়ে থাকতে পারে না বিজু। কদমা আর ক্ষীর থেকে শুরু করে হাঁসের ঘর, বোশেখী বেল আর গৌরী-চাঁপা পর্যন্ত গল্পের সব কথা শুনে নিয়ে মেজদি বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন, কি বলেছে কাজলী?

—কাজলী বলেছে, আমি ছাড়া তোমার গতি নেই।

—বেশ করেছে। কিন্তু তুমি, লক্ষ্মী ভাইটি, তুমি কাজলীর সঙ্গে আর কথা-টথা বলো না।

বিজু আশ্চর্য হয়, কেন মেজদি?

—কাজলী আজ ভাল কথা বলছে, কিন্তু একদিন হয়তো খুব শক্ত একটা কথা শুনিয়ে দেবে।

মেজদিও এবার নতুন রকমের একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। মানিকপুর থেকে যে গো-গাড়িটা বিজুকে নিয়ে যাবে, সেটা আর শিবপুকুর কাছারি-বাড়িতে থামবে না। সোজা চলে যাবে মানকর।

গো-গাড়িটা ঠিক যখন শিবপুকুরের কাছারি-বাড়িটা পার হয়ে চলে গেল, তখন সন্ধ্যার জোনাকি জ্বলতে শুরু করেছে। কাজলীদের বাড়িটাকে আর চোখে দেখতেও পায় না বিজু। কে জানে কেন, গাড়ি থেকে নামবার জন্য বিজুর মনটা একবার ছটফট করে উঠেই শান্ত হয়ে গেল।

বাইরের ঘরে বসে বাবা ডাকছেন, বিজু! বিজু কি মানিকপুর থেকে ফিরেছে?

ছোড়দা ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উত্তর দেন, হ্যাঁ।

—বিজুকে এখানে একবার পাঠিয়ে দে।

—কেন?

—কেন আবার কি? আসুক না একবার।

—বিজুকে পড়তে বসিয়েছি।

—এখন আবার কি পড়ছে বিজু?

—বাংলা ব্যাকরণ।

—বাংলা ব্যাকরণ থাকুক এখন।

—বেশ তো, এখন তাহলে ভূগোল পড়ুক।

—আরে না না। বিজু এখানে একবার আসুক; আমার সঙ্গে একটু পাঞ্জা-টাঞ্জা লড়ুক। তারপর না হয়…।

আর বেশি বলতে হয় না; বিজু নিজেই একটা লাফ দিয়ে যেন এতক্ষণের ব্যাকরণ-ভীরু প্রাণটাকে নাচিয়ে দিয়ে বাইরের ঘরের দিকে ছুটে চলে যায়।

বাবার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বিজু। বাবা বলেন, মন্দ নয়। এই এক বছরে তোর কব্জির জোর বেশ বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

বিজু বলে, কিন্তু তোমার হাতটা গরম কেন বাবা ?

বাবা হাসেন ঃ জ্বর হলে গা তো গরম হবেই।

—জ্বর ? তোমার জ্বর ?

বিজুর পাঞ্জার উপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বাবা আবার হাসেন।—হ্যাঁ রে বিজু।

তারপরেই কেমন যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলেন বাবা—আচ্ছা এখন যা। কমলকে একবার পাঠিয়ে দে।

বাবারও জ্বর হয়, বাবাও হাঁপায় ? বিজুর বিশ্বাসের জগৎটা যেন ভয়ানক একটা বিস্ময়ের প্রশ্নে আহত হয়ে মনমরা হয়ে যায়। কিন্তু উপায় নেই। চোখের উপরে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, রোজই বাবাকে দেখবার জন্য জন্য ডাক্তার আসছেন আর ছোড়দা ওষুধ আনবার জন্য ছুটোছুটি করছেন।

বাবাও এমন নিশ্চল হয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ে থাকতে পারেন ? এমন অসম্ভবও সম্ভব হয় ? কেষ্টনগরের কে না জানে, রাজনগরের নায়েব রুদ্রবাবু একবার নবদ্বীপ-ঘাটের ফেরি লঞ্চের উপর রাগ করে গঙ্গা সাঁতরে ওপারে গিয়ে উঠেছিলেন আর সময়মত আদালতে হাজির হয়েছিলেন। কারণ, যে-লঞ্চের সকাল আটটায় ছাড়বার কথা আটটা বিশ মিনিট হয়ে গেলেও সে-লঞ্চ তখনও কুমড়ো-বোঝাই হবার জন্য পাইকারের নৌকোর আপক্ষায় অলস হয়ে ভাসছিল।

কিন্তু বাবা যে মরতেও পারেন। ডাক্তার চলে যাবার পরেই ছোড়দা যখন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন, তখন হতভম্ব বিজুর বুকটা যেন পৃথিবীর সব চেয়ে নিষ্ঠুর বিস্ময়ের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে কেঁদে ওঠে। বিজুও এত চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে ? বাবা দেখতে পেলে যে লজ্জা পেয়ে আর চেঁচিয়ে হেসে ফেলতেন ঃ ছিঃ বিজু, তুইও যে চেঁচিয়ে কাঁদছিস !

রাত্রিবেলা যখন ছোড়দার গা ঘেঁষে শুয়ে থাকতে হয়, শুধু তখন বিজুর বুকের ভিতরে ছটফটে কান্নাটা যেন শান্ত হয়ে যায়।

বিজুর দু'চোখের ছলছলে ভাবটাও শান্ত হয়ে শুকিয়ে আসতে থাকে। বড়দা এসেছেন, মেজদা এসেছেন, আর মেজমামা তো সকাল-সন্ধ্যা ব্যস্ত হয়েই আছেন। বাবার শ্রাদ্ধের জন্য বেশ জাঁকাল-রকমের একটা আয়োজনের পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ঠিক শ্রাদ্ধের দিনেই ষোল বছর বয়সের দুরন্ত যে বিজুর চোখ দুটো কান্না ভুলে গিয়ে শান্ত হয়ে গিয়েছে, সেই শান্ত চোখ দুটো যেন ভয়ানক একটা সন্দেহের আঘাত পেয়ে চমকে ওঠে।

বড়দা মেজদা আর মেজমামা এত আপত্তি করছেন কেন? বিজুর মাথা কামাবার দরকার নেই কেন? বড়দা, মেজদা আর ছোড়দা, তিনজনই যদি মাথা কামাবে, তবে বিজুই বা বাদ যাবে কেন?

ছোড়দা জেদ ধরলেন, না, সেটা হবে না। হতে পারে না। বিজুও মাথা কামাবে।

বড়দা, মেজদা আর মেজমামা যেন নিতান্ত একটা অনিচ্ছার সঙ্গে কোনমতে আপোষ করে শেষে রাজি হলেন। বিজুও মাথা কামালো। কিন্তু বিজুর প্রাণটা যে কোন মতেই মনের সেই ভয়ানক সন্দেহটার সঙ্গে আপোষ করতে পারে না। কেন? কিসের জন্য? বড়দা, মেজদা আর মেজমামা কোন সাহসে এমন কথা বলে?

ছোড়দাকে জিজ্ঞেস করলে ছোড়দা বারে বারে ওই একই জবাব দিয়ে সরে পড়েন: ওদের কথা ছেড়ে দে। ওদের মাথা খারাপ।

শ্রাদ্ধ তো মিটে গেল। বড়দা আর মেজদাও চলে গেলেন। কিন্তু মেজমামা তবু ব্যস্ত। নিজের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখন যেন এ বাড়ির অদৃষ্টের গার্জেন সেজে বসেছেন। রোজই একগাদা কাগজ-পত্র নিয়ে উকিলবাড়িতে যান আর আসেন। মেজমামা কি সাপুড়ে জাদুকরের মত সংসারের আরও বড় কোন রহস্যের ডালা তুলে ফেলবেন, আর, আরও ভয়ানক কোন বিস্ময়ের সাপ হিস্ হিস্ করে ফণা তুলে বের হয়ে আসবে?

ঠিকই, তাই হল। সন্ধ্যেবেলা আদালত থেকে ফিরে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন মেজমামা। —সব ব্যবস্থা হয়ে গেল রে কমল।

—কি হল ?

—সম্পত্তির পার্টিশন হয়ে গেল। তোর ভাগে পড়ল এই বাড়িটা। রাজনগরের বাড়িটা, ধীরেন আর নরেনের সমান তুই ভাগে ; আর, পলাশীর জমিদারীটা তোদের তিন ভাইয়ের সমান তিন ভাগে।

বিজু বলে ওঠে, তবে আমার ভাগে কি পড়ল ?

মেজমামা বলেন, কিছু নয়। তুমি চুপ কর।

বিজু চেঁচিয়ে ওঠে, কেন চুপ করব ? বাবার সম্পত্তি শুধু তিন ভাই পাবে কেন ? আমি কি মরে গেছি ?

মেজমামা বিরক্ত হয়ে বলেন, তুমি মরেই ছিলে। তোমার থাকা আর না-থাকা তুই-ই সমান। দেখছিস কমল, এইটুকু ছেলের কি রকম টনটনে সম্পত্তিজ্ঞান ?

বিজু বলে, আমি এখনই উকিলবাড়ি যাব। দেখি, কে আমাকে কোন সাহসে ঠকাতে পারে ?

ছোড়দা বিজুর হাত ধরে বলেন, আয়, আমার সঙ্গে আয়। একটা কথা বলব, শুনে যা। আয় বিজু।

বিজুকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আর গাছপাকা পেয়ারার গন্ধে ভরা উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে, যেন নিবিড় একটা প্রতিজ্ঞার আশ্বাস ঢেলে দিয়ে কথা বলেন ছোড়দা, আমি থাকতে তোর আবার সম্পত্তির চিন্তা কেন বিজু ? আমার ভাগের সম্পত্তি তোরও সম্পত্তি।

—কিন্তু মেজমামা তো সে-কথা বলছেন না। উকিলবাবুও সেরকম ব্যবস্থা করেন নি।

—ও ছাই দলিলে যা-ই লেখা থাকুক না কেন, আর আইনে যা খুশী বলুক না কেন, তুই তো আমাদেরই ভাই।

চমকে ওঠে বিজু : আইনে আমি বুঝি তোমাদের ভাই নই ?

বিজুর মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ছোড়দা হাসেন : না রে ভাই ; কিন্তু তাতে কি আসে যায় ?

—না, আমি তোমার বাজে কথার মানে বুঝতে পারছি না। আমাকে ছেড়ে দাও, ছোড়দা। আমি আজই জানব; উকিলবাবুকে, বিধুবাবুকে, সাবিত্রী মাসিমাকে সবাইকে জিজ্ঞেস করব। আমি এখনই বের হয়ে গিয়ে জেনে আসব, আমি তবে কে?

—ছিঃ, কোন দরকার নেই। আমি আমার সম্পত্তির একটা ভাগ তোর নামে দলিল করে দেব বিজু। তুই কিচ্ছু ভাবিস না।

ছোড়দার সেই ব্যাকুল আদরের হাত দুটো যেন দম বন্ধ করবার দুটো ফাঁসির দড়ি। কিংবা, একটা মিথ্যে মায়ার মিথ্যে তোষামোদ। সহ্য করতে পারা যায় না। ছোড়দার হাত দুটোকে দুরন্ত একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়েই ছুটে চলে যায় বিজু।

অনেক রাত, মাঝরাতও বোধহয় তখন পার হয়ে গিয়েছে, বাড়িতে ফিরে এসেই দেখতে পায় বিজু, একটা নেবানো লণ্ঠন আঁকড়ে ধরে আর জুতো পায়েই বিছানার উপর যেন দুর্ঘটনায় মরা একটা মানুষের মত এলোমেলো হয়ে শুয়ে পড়ে আছেন ছোড়দা। বুঝতে পারা যায়, বিজুকে খুঁজতে বের হয়ে আর অনেক হয়রান হয়ে ফিরে এসেছেন ছোড়দা। এখন বোধহয় স্বপ্ন দেখছেন, বিজু ফিরে এসেছে; কিংবা খোঁজ করলেই বিজুকে পাওয়া যাবে।

না, অসম্ভব। বৃথা স্বপ্ন দেখছেন ছোড়দা। বিজু এ জীবনে আর এ বাড়িতে আসবে না।

ছোড়দার মাথার বালিশের কাছে চিঠিটা রেখে দেয় বিজু—সবই জেনেছি ছোড়দা। আমি বাবার ছেলে বটে, কিন্তু তোমাদের ভাই নই। আমি বাবার রাজনগরের বাড়ির এক ঝিয়ের ছেলে। আমার সে ঝি-মা মরে যাবার পর বাবা আমাকে এ বাড়িতে এনে আর আদর করে পুষেছিলেন। বাস; আমার আর কিছু বলবার নেই। যাই ছোড়দা।

কেষ্টনগরের আকাশের তারা ঝিকঝিক করে। জলঙ্গীর জল ছলছল করে। একটা নিশাচর একলা নৌকোর বৈঠা ঝুপঝাপ

করে। মুচিপাড়ার কুকুর কিন্তু ঘেউ ঘেউ করে না, শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে।

তারপরেই খোলামেলা ধানক্ষেতের বাতাস ফুরফুর করে। বুঝতে পারে বিজু, কেষ্টনগর নামে একটা শ্মশানের সীমা ছাড়িয়ে প্রাণটা অনেক দূরে চলে এসেছে। এ রাত্রি ভোর হবার আগে আরও অনেক দূরে চলে যেতে পারা যাবে।

॥ চার ॥

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, সে নদীর আক্ষেপ হল হারিয়ে যাওয়ার আক্ষেপ। হারিয়ে যেতে চায় নি সে নদী। কিন্তু ষোল বছর বয়সের বিজনবিহারীর জীবনের নদীটা যেন ইচ্ছে করেই ধারা হারাতে চায়। বাংলা দেশের মাটির ছোঁয়া থেকে পলাতক একটা প্রাণ সত্যিই সুদূরের এক মরুপথে এসে তার ধারা হারিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে।

একেবারে রাজস্থান, যার সঙ্গে বাংলা দেশের মাটি নদী আর গাছপালার কোন মিল দেখা যায় না। চিতোরের এক উটওয়ালার কাছে চাকর হয়ে খেটে খেটে বিজনবিহারীর জীবনের পুরো একটা বছর কেটে গিয়েছে।

কিন্তু একটুও কি ভয় পেয়েছে বিজনবিহারী? একটুও না। প্রথম দিনটা উটের গায়ের সেই বীভৎস গন্ধে গলা থেকে এক ঝলক বমি উথলে পড়েছিল। কিন্তু তারপর আর নয়। তারপর নিজের হাতেই উটের পুরীষের ঘুঁটে পুড়িয়ে, জওয়ারের চাপাটি সেঁকে, আর সেই চাপাটি কাঁচা গাজরের সঙ্গে চিবিয়ে খেতে একটুও খারাপ লাগে নি। দড়ির মত করে পাকানো লাল শালুর মস্ত বড় একটা মুড়েঠা মাথায় বেঁধে, তুলোর মেরজাই গায়ে চড়িয়ে, আর কাঁচা চামড়ার নাগরা পায়ে দিয়ে চিতোরগড়ের ডাঙ্গার কাঁটাজঙ্গল থেকে মাদার পাতার বোঝা মাথায় বয়ে নিয়ে বাজারের উটের আস্তানায় ফিরে আসবার সময় পশ্চিমের আকাশে যে সূর্যাস্ত দেখতে পায় বিজনবিহারী, সে সূর্যাস্তের চেহারার সঙ্গে কেষ্টনগরের সূর্যাস্তের মিল নেই; মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। কিন্তু দেখতে ভাল লাগে। এ আকাশে সূর্যাস্তের রঙ ছলছল করে না, যেন দাউ-দাউ করে জ্বলে।

মিল নেই বলেই ভাল লাগে। চিতোরগড়ের রাতের নীরবতার মধ্যেও মাঝে মাঝে, বিশেষ করে যে রাতে জ্যোৎস্না থাকে, ময়ূরের ঝাঁক ডেকে ডেকে উড়ে বেড়ায়। বিজনবিহারীর প্রাণটা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ময়ূরের ডাকের যত প্রতিধ্বনির উৎসবের মধ্যে ডুবে যায়। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। যদি এখানেও বউ-কথা-কও কখনও ডেকে ওঠে, তবে বোধহয় সেই মুহূর্তে চিতোর ছেড়ে দিয়ে একেবারে জয়সলমীরের দিকে চলে যাবে বিজন।

চিতোরের উটওয়ালা মালিক মাইনে বাবদ একটা পয়সাও দেয় না বলেই কাজটা ছেড়ে দিতে হল। তারপর ঝান্‌সি। মেওয়া-ওয়ালা মদনলালের দোকানে পুরো দু'টি বছর চাকরি করতে হয়েছে। মাইনে দিতে কিপটেমি করে নি মদনলাল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাইনের লোভ ছেড়ে দিতেই হল।

দোকানঘরের পিছনের একটা অন্ধ কুঠুরি, সেই কুঠুরির ভিতরে একটা তয়খানা, যেন রসাতলে যাবার একটা সুড়ঙ্গঘর। এই তয়-খানার ভিতরে পচা মেওয়া চোলাই করে মিঠা মদ আর খুশবুদার মদ তৈরি করে মদনলাল, রহিসোঁকে দিল বহলানেকে লিয়ে।

দোকানঘরের কাজ তেমন কিছু নয়। আসল কাজটা, এই তয়খানার ভিতরে মাঝরাত পর্যন্ত জেগে জেগে কাঠের গামলায় পচা মেওয়া চটকাতে হয়। বিজনবিহারীর দুহাতের মাংসের পেশীগুলি এরই মধ্যে পচা মেওয়া চটকাতে গিয়ে কত মজবুত হয়ে ফুলে উঠেছে।

কিন্তু কাজটা কপালে সইল না। পালিয়ে যেতে হল। যে রাতে মেওয়াওয়ালা মদনলালের দোকানের উপর হানা দিল আবগারি পুলিস, সে রাতেই, সেই মুহূর্তে, তয়খানা থেকে বের হয়ে, পিছনের আঙিনার একটা গাছ বেয়ে পাঁচিলের উপর উঠে, আর ওপাশের শেখ সাহেবের আস্তাবলের চালার উপর লাফিয়ে পড়ে, তারপর যেন একেবারে অশরীরী হয়ে উধাও হয়ে যায় বিজন।

ঢোলপুরে রেলের এক সাহেবের বাড়িতে বেয়ারা হয়ে আরও

একটা বছর। শেষরাতের আবছায়ার মধ্যে চম্বলের বালিয়াড়ির উপর দাঁড়িয়ে হরিণ শিকার করতে ভালবাসেন ডি টি এস মিস্টার ব্রাইট। দোনলা হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ডটা মিস্টার ব্রাইটের হাতে থাকে, আর বেয়ারা বিজনবিহারীর হাতে থাকে একটা একনলা মার্টিন হেনরি। ভীরু, চিতল হরিণ নয়, একদিন সাংঘাতিক গাঁট্টাগোট্টা একটা লেপার্ড পিছনের একটা ফনিমনসার ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে এসে মিস্টার ব্রাইটের ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু সাহেবের গায়ে একটা আঁচড়ও দেগে দিতে পারে নি লেপার্ডটা, চামড়ার জার্কিনের কলারটাকে শুধু এক কামড়ে ছিঁড়ে দিতে পেরেছিল। আর, বেয়ারা বিজনবিহারীর হাতের বন্দুকের এক গুলিতে সে লেপার্ডের বুকও সেই মূহূর্তে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল।

তারপর জব্বলপুর। লাইনম্যান বিজনবিহারী। দেশে চলে যাবার আগে মিস্টার ব্রাইটই সুপারিশ করে বিজনবিহারীকে এই কাজে বহাল করিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

লোকে বলে, স্টেশনের ইয়ার্ড। বিজনবিহারী জানে লোহার পাঁজরা দিয়ে ছাওয়া এই ইয়ার্ডই তার জীবনের জগৎ। বাইরের সংসারের যত ভিড় এসে এখানে উপচে পড়ে আর মিলিয়ে যায়। কখনও লাল আর কখনও সবুজ, আলো আর নিশানের অফুরান সঙ্কেত যেন এখানে নীড় বেঁধে বসে আছে। ট্রেন বোঝাই হয়ে বাইরের পৃথিবীর যত হর্ষ আর কলরবের ভার এখানে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বিজনবিহারীও যেন তাদের সবারই যাওয়ার পথের কাঁটা সরিয়ে দেয়। শাবল দিয়ে ছোট্ট একটি আদুরে আঘাত, ঠুং করে একটি শব্দ শিউরে ওঠে, আর লাইনের লোহার ফাঁক গায়ে গায়ে জোড়া লেগে যায়। মনে হয়, লোহার শিব যেন বুক পেতে দিল। তার পরেই হু হু ছুটে আসে থ্রী আপ কিংবা ফোর ডাউন। সত্যিই মনে হয়, যেন একটা শব্দের এলোকেশীর নাচন সেই লোহার বুক মাড়িয়ে ছুটে চলে গেল।

ট্রেনবোঝাই এই সব হর্ষ আর কলরব নিশ্চয় নিজের দেশে যায়। ওদের দেশ আছে, ঘরও আছে। সবাই হয়তো নিজের দেশের দিকে যাচ্ছে না; কেউ কেউ দেশের দিক থেকে এসে কোন অদেশের দিকে চলে যাচ্ছে। যেখানেই যাক্, শেষ পর্যন্ত একটা আশার ঘরে গিয়েই তো ওরা জিরবে আর ঘুমুবে।

কিন্তু ডিউটি শেষ হলে যে ঘরে গিয়ে জিরতে আর ঘুমতে পারে বিজন, সেটা আশার ঘর নয়, জি ব্লকের একটি কুঠরী; একটা বেঁটে দরজা, আর ঘুলঘুলির মত ছোট্ট একটা জানলা। জানলার কাছেই দেওয়াল-ঘেঁষা ড্রেনের মধ্যে কাদামাখা শূয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। পাশেই এইচ ব্লকের যত কুঠরীর সারি, সব-চেয়ে নীচের ক্লাসের যত মিনিয়াল আর ধাঙ্গড়দের ঘর। জানলাটা এক বেলা খোলা থাকলে কয়লার ধোঁয়া ঘরে ঢুকে দড়িতে টাঙানো জামা-কাপড়ের গায়ে লম্বা লম্বা ঝুল ধরিয়ে দেয়, দেখতে কালো-কালো সাপের খোলসের মত।

যেন জীবনের যত আশার একটা কয়েদঘর। এ চাকরির মেয়াদ ফুরলে তবেই বোধহয় এই জি কুঠরির আশ্রয় থেকে সরে গিয়ে আবার ভাবতে হবে, আবার কোথায় যাওয়া যায়। কোন না কোন দিকে চলে যাওয়া যাবে নিশ্চয়; কিন্তু বাংলা দেশের দিকে নিশ্চয় নয়; ভুলেও নয়।

নীলরঙা কামিজ আর নীলরঙা বেঁটে প্যাণ্টালুনে জড়ানো একটা চেহারা হয়ে, লণ্ঠনটা হাতে ঝুলিয়ে রাতের ইয়ার্ডের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেও মন্দ লাগে না। বেশ ভালই লাগে, যখন শান্টিং-এর ইঞ্জিনগুলি এক-একটা চিৎকারের রাক্ষসের মত ডাইনে বাঁয়ে ছুটোছুটি করে।

—এ বিজাওন! লোকো শেডের গেটম্যান টহলদার সিং যখন চেঁচিয়ে ডাক দেয়, তখন বিজনও খুশীর স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে পারে—রাম রাম চাচা! বোলিয়ে কেয়া খবর!

—খবর কুছ নেহি, এক বাত পুছ্না হ্যায়।

—বোলিয়ে।

—সাদি-উদি করোগে কি নেহি?

—সাদি কি অ্যায়সি-ত্যায়সি! চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিজন।

টহলদার সিং চোখ পাকিয়ে ধমক দেয়ঃ জওয়ানি বরবাদ করোগে, কেয়া?

—জওয়ানি নর্মদামে বহা দেঙ্গে। হেসে হেসে জবাব দেয় বিজন।

চাচাজী টহলদার সিং-এর চোখ দুটো যেন হঠাৎ একটু মুচকে হেসেই কুঁচকে যায়।—তব্ দের কেঁও? বঙ্গাল মুলুকসে এক ছোটি-মোটি নাজুকবদন নর্মদাকো উঠা লে কর্ চলে আও।

চাচাজী টহলদার সিং আর একবার মুচকে হেসে নিয়ে চলে যায়। শুধু আজ নয়, আরও কতবার এই ধরনের হাসির কথা শুনিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে চাচাজী। চাচাজীর এইসব মুচকি হাসির ভাষা যেন বিজনবিহারীকে বার বার এই সত্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, জীবনের আরও দুটো বছর এই জব্বলপুরে পার হয়ে গিয়েছে। বয়সটা বাইশের কোঠাও পার হয়েছে। ইস, কত তাড়াতাড়ি বয়সটার হাত থেকে খেলার ঘুড়ি-নাটাই খসে পড়ে গেল; আর হাতে উঠে এল একটা কাজের লোহার শাবল।

কি আশ্চর্য, স্বপ্নের মধ্যে এখনও যে মাঝে মাঝে বাংলা দেশের একটা ধানক্ষেতের হাওয়া ফুরফুর করে, আর সেই ফুরফুরে হাওয়াতে বিজনবিহারীর প্রাণের একটা রঙীন খুশীর ঘুড়ি আকাশে ভেসে ভেসে দুলতে থাকে। দুলতে থাকে শিবপুকুর, গৌরীচাঁপা, বোশেখী বেল আর···আর কাজলী।

ছিঃ, স্লেটের সব অঙ্কের দাগ এত ভাল করে মুছে দেবার পরেও একটা দাগ কেন আবার ফুটে ওঠে? ফুটে ওঠেই বা কেমন করে? কাজলীও তো আর সেই কাজলী নেই। ছোট নয়, বোকাও নয়। বড় হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, আর ঘেন্না করতেও শিখেছে।

কাজলীরও কি আর কিছু বুঝতে বাকি আছে? মানিকপুরের [illegible] অদ্ভুত ভাইটা যে একটা বে-আইনী প্রাণ, একথা কি

আজ কাজলীরও অজানা আছে? কাজলী বোধহয় এখন স্বপ্ন দেখে ভয় পায়, বিজনবিহারী নামে একটা অস্পৃশ্য ছায়া ওর কাছে জল খেতে চাইছে। বোধহয় ঘুমের মধ্যেই ঘেন্না করে চেঁচিয়ে ওঠে কাজলী: সাবধান, তুমি আর এখানে এস না।

সত্যিই কি তাই? নাইট ডিউটি শেষ হবার পর হাতের লণ্ঠন আর শাবল নামিয়ে রেখে ইয়ার্ড-মাস্টারের অফিস ঘরের কাছে পাথরের বেঞ্চিটার উপর চুপ করে বসে যখন হাঁপ ছাড়ে বিজন, তখন শিশির-ভেজা চাঁদটা ঘোলাটে হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ডুবছে। রাতের আকাশটাকে ছেড়ে যাবার দুঃখে চাঁদটা যেন নিজের চোখের জলে মুখটাকে ভিজিয়ে দিয়ে ঘোলা হয়ে গিয়েছে। মনে হয়, জি কুঠ্‌রির কালিঝুলিময় বুকটা সত্যিই একটা শাস্তির কয়েদঘর।

নিজেরই নিশ্বাসের শব্দগুলিকে শুনতে পায় বিজন, আর লজ্জাও পায়। নিশ্বাসের শব্দের মধ্যে যেন একটা ব্যাকুল লোভের শব্দও বেজে চলেছে। মানকর স্টেশনের সেই বুড়ো নিমকিওয়ালাকে আর একবার দেখবার জন্য মনটা ছটফট করে উঠছে। লোকটা কি এখনও বেঁচে আছে? তখনই তো তার বয়স ছিল আশীর কাছাকাছি।

লোভটা বোধহয় খুব লাজুক, নয়তো চালাক, নয়তো ভণ্ড, নয়তো ভীরু; বুড়ো নিমকিওয়ালার জন্য দরদ দেখাবার ছুতো করে মানকর স্টেশনে দাঁড়িয়ে শিবপুকুরের দিকে তাকিয়ে আছে।

যে প্রতিজ্ঞাটা কেষ্টনগরকে এক কথায় ঘেন্না করে আর তুচ্ছ করে চলে আসতে পেরেছে, সে প্রতিজ্ঞার সব জোর শিবপুকুরের কাছে হার মানতে চায় কেন? মনটা সত্যিই যে চোরের মত উঁকিঝুঁকি দিয়ে যখন-তখন কাজলীর মুখটা দেখতে চায়।

চাচাজী টহলদার সিং আবার যেদিন দেখা হতেই চোখ টিপে টিপে হাসে, সেদিন সকাল বেলাতেই ফোর ডাউন যেন বাংলা ভাষার একটা ঝংকার তুলে প্ল্যাটফর্মের গায়ে এসে লাগল। ট্রেনের অন্তত দশটা কামরা বাঙালীতে ভর্তি। বুড়ো-বুড়ি, তরুণ-তরুণী, ছেলে-মেয়ে, সব বয়সের মানুষ কলকল করে হাসছে আর কথা বলছে। তার

মধ্যে কাজলীর বয়সের মেয়েও আছে। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, একজনও কাজলীর মত সুন্দর নয়।

আকাশের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারে বিজন, শরৎকালের ডাক এসেছে। বাংলা দেশের আকাশের রঙ এখন নীলমণি গলানো রঙ। হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন—সেকেণ্ড পণ্ডিত গুরুদয়াল বাবুর হুংকার শুনেও, আর অনেক চেষ্টা করেও এর পরের লাইনটা মুখস্থ করতে পারে নি বিজনবিহারী। তবু বুঝতে অসুবিধে নেই, শরৎকাল এসেছে, তাই বাঙালীর দল বঙ্গদেশে চলেছেন, কে জানে কোন্ ছাই বিবিধ রতন দেখবার জন্য।

ওরা ছুটি পেয়েছে, পূজোর ছুটি। ফোর ডাউন আবার বাংলা ভাষার ঝংকার তুলে চলে গেল।

চাচাজী ডাকে, এ বিজাওন।

—বলুন।

—তোমারও ত ছুট্টি পাওনা আছে।

—আছে।

—ছুট্টি নাও তবে।

—কি দরকার?

—আরে বুদ্ধু, ছুট্টিই যে একটা দরকার।

জবাব না দিয়ে নীরব হয়ে কি যেন ভাবে বিজনবিহারী।

চাচাজী বলে, ছুট্টি পাওনা হলেও যে ছুট্টি নেয় না, সে বুদ্ধু আওরভি কিছু আছে; সে বুদ্ধু পাগল আছে।

বিজনবিহারীর মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে যায়। চাচাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে আনমনার মত বিড়বিড় করে বিজন: ছুটি নেব তবে?

চাচাজীও স্নেহকোমল স্বরে উপদেশ দেয়, লেও বেটা। ছুটি নিলে মেজাজ ভাল হয়, আর কাজেও আবার নতুন ফুর্তি পাওয়া যায়।—ইনসানকা জান ধোবিকা কুত্তা নেহি হ্যায়, বিজাওন।

চমকে ওঠে বিজনবিহারীর বাইশ বছর বয়সের বুকটা। না ঘাটকা না ঘরকা, সত্যিই কি ধোবিকা কুত্তা হয়ে গেল বিজনবিহারীর জীবন?

॥ পাঁচ ॥

ভোরের চা-ওয়ালা হাঁক দেয়—মানকর।

ট্রেনটা থেমেছে। আর ট্রেনের একটা কামরার ভিতরের ঘুমন্ত বিজনবিহারীর স্বপ্নটাও যেন ডাক দিয়ে ফেলেছে—মানকর। আর, দুচোখে যেন সেই স্বপ্নেরই আবেশ সঙ্গে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে বিজনবিহারী।

বুড়ো নিমকিওয়ালাকে দেখতে পাওয়া গেল না; কিন্তু কি আশ্চর্য, প্ল্যাটফর্মের সেই কাঞ্চন গাছটা আছে, যেটাতে টুকটুকে লাল ফুলের হাসি আলো হয়ে ফুটে থাকত। মানকর স্টেশনের চেহারা এই ছয় বছরের মধ্যে একটুও বদলে যায় নি।

কিন্তু একটানা হেঁটে শিবপুকুর পৌঁছে গিয়ে একটা মাটির বাড়ির আঙিনার উপর এসে যখন দাঁড়ায় বিজন, তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না, শিবপুকুরের সব আলো-ছায়া বদলে গিয়েছে।

বটুকবাবু আশ্চর্য হয়ে বলেন, তুমি?

কাজলীর মা চমকে ওঠেন, তুমি?

সত্যিই কি বিজনকে দেখে ভয় পেলেন কাজলীর বাবা আর মা? বিজনকে কদমা, ক্ষীর আর মুড়ি খেতে দিতে কোন ইচ্ছে নেই?

তাইতো মনে হয়। তা না হলে আর একটাও কথা না বলে দুজনেই ঘরের ভিতর চলে যাবেন কেন? দাওয়ার উপর রাখা ওই মোড়াটার উপর বিজনকে বসতে বলতেও দুজনেই ভুলে যাবেন কেন?

আঙিনার উপর মস্ত একটা আলপনার দাগ একটু ময়লা হয়ে গিয়েও এখনও হাসছে। ওটা কি তবে কাজলীর জীবনের একটা উৎসবের স্মৃতির দাগ? কাজলী আর এ বাড়িতে নেই? কোন আশার ঘরে চলে গিয়েছে কাজলী?

তাইতো সন্দেহ করতে হচ্ছে। এ-শিবপুকুরে বোধহয় আজকাল আর গৌরীচাঁপা ফোটে না। পুরনো মন্দিরের পাঁচিলের গায়ের কাছে সে গাছটাকেও যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

শুনতে পায় বিজন, ঘরের ভিতরে বটুকবাবু যেন চেঁচিয়ে উঠলেন—যাস নি কাজলী। সাবধান!

কাজলীর মা ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, যাস নি, যাস নি কাজলী।

কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে যেন চাঁপাফুলের একটা স্তবক ছুটে বের হয়ে আসে আর বিজনবিহারীর চোখের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে ওঠে—চিনতে পার?

সত্যিই কাজলী। গৌরীচাঁপাও দেখতে বোধহয় এই রকমের কাজলীর সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ, গলায় সোনার হার, পায়ে আলতা, আর খোঁপাতে রুপোর প্রজাপতি।

কাজলী বলে, আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আর পনের দিন আগে এলে বিয়েটা দেখতে পেতে, আর পেট ভরে লুচি-সন্দেশও খেতে পেতে।

বিজন হাসে : বড় ভুল হয়েছে।

—কিসের ভুল?

—সময় মত এলে বিয়ের নেমতন্নটা খেতে পেতাম।

—সময় মত আসতে পার নি কেন? মনেই পড়ে নি নিশ্চয়?

—মনে পড়েছিল।

—ছাই মনে পড়েছিল।

বিজন আবার হাসতে চেষ্টা করে, বিশ্বাস কর।

—একটুও বিশ্বাস করি না। মনে পড়লে ছ'টা বছর এভাবে পালিয়ে থাকতে পারতে না। আগেই আসতে। তাহলে আজ আর···।

—কি বলছ?

—আজ আর বলে কোন লাভ নেই।

কি আশ্চর্য, কাজলীর চোখের পাতাগুলি যে ভিজে গিয়েছে। ঠোঁট দুটোও যেন ফুঁপিয়ে উঠতে চাইছে।

—আমি কেন চলে গেছি, সেটা তুমি বোধহয় জান না।

—খুবই জানি। সবই জানি। সব শুনেছি।

—তবে আর একথা বলছ কেন? আমি আগে এলেই বা কি হত?

—সব হত।

চমকে ওঠে বিজন, কি বললে?

—খুব স্পষ্ট করেই তো বলছি। তুমি 'হ্যাঁ' বললে আমি 'না' বলতাম না। কখ্খনো না। আমি যে সত্যিই ভেবেছিলাম, তুমি ঠিক সময় মত এসে পড়বে। না এসে পারবে না।

বটুকবাবু চেঁচিয়ে ডাক দেন, গো-গাড়ি তৈরি হয়েই আছে বিজন। বেলাবেলি মানিকপুরে পৌঁছে যাওয়াই ভাল।

বিজন বলে, গো-গাড়ির দরকার নেই মেসোমশাই; আমি মানিকপুর যাব না।

—তবে কোথায় যাবে?

—কোথাও না। বলতে বলতে পিছু ফিরে দাঁড়ায় বিজন; তার পরেই যেন একটা একরোখা ঝড়ের বাতাসের মত ছুটে চলে যায়।

মানকর স্টেশনের কাঞ্চন গাছটা তবু হাসছে। একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে; সে ট্রেন কোথায় যাবে, কোন্ দিকে যাবে, খোঁজ নিতেও ভুলে যায় বিজন। যেন ফেরারী আসামীর মত একটা উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি; ছুটে গিয়ে একটা কামরার ভিতর ঢুকে পড়ে।

হাত তুলে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে মনে হয়, কপালটা বুঝি রক্তে ভিজে গিয়েছে। ভয়ানক একটা ঠাট্টার ভূত হেসে হেসে কপালের উপর কাঁটাভরা হাতের একটা চাপড় ঠুকে দিয়ে সরে পড়েছে। বাংলা দেশের আকাশ দেখবার লোভটা হোঁচট খেয়ে কাদার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছে। খুব হয়েছে। শিবপুকুর কোন গাঁয়ের

নাম নয়। শিবপুকুর একটা গলাধাক্কা শাস্তির নাম। বিজনবিহারীর দুরাশার প্রায়শ্চিত্তের নাম। চোর ফিরে এসে দেখেছে, তার চুরি-করা সোনার ঘড়া চুরি হয়ে গিয়েছে।

ভালই হয়েছে। জব্বলপুরের ইয়ার্ড-মাস্টারের অফিস-ঘরের কাছে বেঞ্চির উপর বসে নাইট ডিউটির লাইনম্যানকে আর মাঝরাতের চাঁদের চেহারা দেখবার জন্য চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকতে হবে না। কালিঝুলিমাখা জি কুঠুরীর ঘুমটাও আর স্বপ্ন দেখবার সাহস করবে না। একটা বদ্ধ পাগল না হয়ে গেলে. এরপর আর কাজলীর মুখটা মনে করবার দরকার হবে না।

এটা কোন্ স্টেশন? রাতই বা কত হল? যাত্রীতে ঠাসা এই কামরাটার এই বেঞ্চির এই কোণে একটা বাসি লাসের মত অসাড় হয়ে পড়ে থেকে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে বিজন?

কিন্তু সত্যিই যে একটা স্বপ্নের কথা শুনতে পেয়ে ধড়ফড় করে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে। কি আশ্চর্য, দুহাতে চোখ দুটো ঘষলেও যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের এক কোণে কাঞ্চন গাছটা হাসছে, অথচ স্টেশনটা মানকর নয়, মানকর হতেই পারে না।

গোমো জংশন। এবং এই গোমোর এই প্ল্যাটফর্মের কোনদিকে কোন কাঞ্চন গাছ নেই। হেসে ফেলে বিজন। আর বুঝতেও পারে, বুকের ভিতর সব নিশ্বাস যেন হাসছে। ভাবতে খুবই ভুল করেছিল বিজন। শাস্তি পেয়ে নয়; হেরে গিয়ে নয়, বিজনের প্রাণটা যে জয়ীর মত একটা তৃপ্তির উপহার নিয়ে, গৌরীচাঁপার মত মায়া-ফুলের মস্ত বড় একটা মালা গলায় দুলিয়ে চলে যাচ্ছে। কাজলী যে স্বপ্নের মধ্যেও এসে কথাগুলি শুনিয়ে দিয়ে গেল: আসতে দেরি করলে কেন?

কোন সাহসে এমন কথা বলতে পারে কাজলী? অথচ কাকে বলছে, তাও সে জানে! যার প্রাণটা পৃথিবীর কোন দাদা-দিদির ভাই নয়; বাপ-মায়ের ছেলে নয়; যার ছায়ার কাছেও কোন ভাল-

মানুষের মেয়ে আসতে চাইবে না, আইন যাকে একটা মিথ্যেমানুষ বলে মনে করে, তাকেই আশা করেছিল কাজলী ? কাজলী যেন সংসারের যত নিয়মের শাসন তুচ্ছ করে, একটুও ভয় না পেয়ে জানিয়ে দিয়েছে, বিজনবিহারীর প্রাণের জন্ম একটা অনিয়মের রহস্য হলেও তাকে ঘেন্না করতে, ঠাট্টা করতে আর দয়া করতে চায় নি কাজলী ; ভালবাসতে চেয়েছিল।

ভালবেসেছিল বোধহয়। তা না হলে ওকথা অত স্পষ্ট করে বলবে কেন কাজলী ?

তবে আর কিসের আক্ষেপ ? কিছুই না। চাচাজীকে বরং হেসে হেসে শুনিয়ে দিতে পারা যাবে, তুমি যা বলেছিলে তার চেয়েও অনেক সুন্দর একটি নর্মদাকে আমি পেয়ে গেছি চাচাজী, যদিও তাকে তুমি কোনদিন আমার ঘরে দেখতে পাবে না। তা ছাড়া, আমার যে কোনদিনই ঘর হবে না। ঘর করবার অধিকারও যে আমার নেই। কোথাও ঘর যদি বাঁধি, তবে লোকে সেই ঘরের দিকেও তাকিয়ে ঠাট্টার হাসি হাসবে, বেনো নদীর চরের গর্তে ক্ষেপা শেয়ালের ঘর দেখে মাচানের চাষী যেমন হাসে। ঠাট্টাটা যদি খুব ভদ্র হয়, তবে হয়তো দয়া করে বলবে, অদ্ভুত ঘর ; মেজ জামাইবাবু যেমন মেজদিকে বলেন, তোমার সেই অদ্ভুত ভাই। মেজ জামাইবাবু মানুষটা তো অভদ্র নয়।

সুতরাং বিজনবিহারী পরোয়া করে না, চাচাজী। সে ঘর চায় না। ঘরকে সে ঘেন্না করে। তোমাদের নিয়মের দুনিয়াতে যত ঘর আছে, সব, সব ঘরকেই যত প্রেতের ঘর বলে মনে করে বিজনবিহারী।

॥ ছয় ॥

আর জব্বলপুরে নয়।

নতুন রেল লাইন পাতবার জন্যে যে সার্ভে পার্টি উড়িষ্যার জঙ্গল পার হয়ে আর তাঁবু ফেলে ফেলে পালামৌয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, সেই পার্টির সঙ্গে চেনম্যান হয়ে কাজ করে ছুটি বছর ফুরিয়ে যায়, তবু বিজনবিহারীর মনে এতটুকু আক্ষেপ নেই যে, জীবনটা যাযাবর হয়ে গেল। তাঁবুই ভাল। কোন জায়গায় এক মাসের বেশি ঠাঁই নিতে হয় না। জংলী হাতী তাড়াবার ডিউটিটা আরও ভাল লাগে। সারা রাত মশাল জ্বেলে জেগে থাকা, আর টিন পেটানো। যে সাহস কেউ করতে পারে না, সে সাহস করবার জন্য বিজনবিহারী যেন খুশী হয়ে এগিয়ে যায়। বাঁশের জঙ্গলের ভিতরে মট্‌মট্‌ ছুটোপুটির শব্দ শোনা মাত্র ক্যাম্প থেকে বের হয়ে এক'শো গজ দূরের খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেবার ডিউটিটা বিজনবিহারী ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছে। চীফ সার্ভেয়ার সাহেব খুশী হয়ে বিজনবিহারীকে প্রত্যেকটি হাতী তাড়ানো সাহসের জন্য পাঁচ টাকা বকশিস দিয়ে থাকেন।

আরও একটি বছর। সার্ভে পার্টির তাঁবু যেদিন কোয়েল নদীর এপারে এসে পৌঁছল, সেদিন চীফ সাহেব বললেন, হাম অব হোম চলে গা ; মেম সাহেব বহুৎ কড়া চিঠি ছোড়া হ্যায়।

অদ্ভুত ব্যাপার ; হোমপ্রিয় চীফ সাহেব এত লোকের মধ্যে বেছে বেছে চেনম্যান বিজনবিহারীকেই বললেন, ব্রেভ চেনম্যান, তুম্‌ভি অব ঘর যাও।

—ঘর নেহি হ্যায় সাহেব।

—ঘর বনাও।

চম্‌কে ওঠে বিজনবিহারী।

—তুম আর্থ-কাটিংকা কণ্ট্রাক্টর বন্ যাও। হাম বন্দোবস্ত কর দেগা।

হোম যাবার আগে চীফ সাহেব তাঁর প্রতিশ্রুতির কথাটা ভুলে যান নি। চীফ সাহেব হোম চলে যাবার পরে দুটো মাসও পার হয় নি, গোমোর রেল অফিস থেকে একটি চিঠি পেয়ে বুঝতে পারে বিজনবিহারী, নতুন লাইনের জন্য মাটি কাটবার ঠিকাদারী যদি করতে হয়, তবে ওই সিংহানী পাহাড়ের দক্ষিণে এক অজানা-অচেনা জঙ্গলের বুকের ভিতর ঢুকে কোন মুণ্ডা কিংবা ওরাওঁ গাঁয়ের গাছতলায় খেজুরপাতার ছাউনি দেওয়া একটা ঠাঁই তৈরি করে নিতে হবে।

দেখে খুশী হয় বিজনবিহারী ; না, খেজুর পাতার ছাউনি তৈরি করতে হবে না। উটগাড়ি থেকে নেমে, আর সড়কের মোড়ে দাঁড়িয়ে চারদিকের জঙ্গলটার দিকে তাকিয়েও খুশী হয়। যেন বাইরের হৈ-হৈ সভ্য-ভব্যতার ভয় থেকে ফেরার হয়ে একটা শান্ত নিরালা এখানে এসে শালের হাওয়াতে খুশী হয়ে পড়ে আছে। একটা হালুয়াইয়ের দোকান, একটা সরাই-ঘর আর একটা মহুয়া-চোলাই ভাঁটি। মাটির দেওয়াল আর খাপরার চালা দিয়ে তৈরি তিনটে ক্ষুদে চেহারার বাড়িতে শুধু তিনটে মানুষ বাস করে—হালুয়াই রামসিংহাসন, সরাইওয়ালা হীরারাম আর ভাঁটিদার গুলু মিঁয়া।

এই সরাই-ঘরে আর কতদিন থাকা যাবে? মাঝে মাঝে গরুর পিঠে শুকনো লঙ্কার বস্তা চাপিয়ে করনপুরার বেনিয়ারা যখন হাজির হয়, তখন সরাই-ঘরে আর লোক ধরে না। নেকড়ের ভয়ে গরু আর লঙ্কার বস্তা নিয়ে বেনিয়ারা সারা রাত ঘরের ভিতরেই গাদাগাদি করে পড়ে থাকে আর ঘুমোয়।

রামসিংহাসন বলে, যতদিন না একটা ডেরা বানিয়ে নিতে পারেন, ততদিন আমার দোকানের পিছনের ঘরটায় থাকতে পারেন।

বিজনবিহারী বলে, বহুৎ আচ্ছা।

রোগা শালের খুঁটি, এবড়ো-খেবড়ো মাটির দেওয়াল আর খাপরার চালা ; দরজায় কাঠের কপাট নয় ; খেজুর পাতার একটা ঝাঁপ।

ঘরটাকে দেখিয়ে দিয়ে রামসিংহাসন বলে, এর মধ্যে থাকতে যদিও আপনার বেশ কষ্ট হবে···।

বিজন বলে, বল কি? আমার পক্ষে এটা যে একটা কেল্লা-ঘর, রামসিংহাসন!

কিন্তু একবার যে কলকাতা যেতে হবে। কোদাল গাঁইতি আর শাবলের জন্য রেল-কোম্পানীর সাপ্লাই এজেণ্ট ভুরামল ব্রাদার্সকে ধরতে হবে, যেন অন্তত এক বছরের মেয়াদে মালটা ধারে দিতে রাজি হন।

কলকাতা যাবার পথে, রাতের মানকর স্টেশনটার দিকে ইচ্ছে করেই তাকায় নি বিজনবিহারী। সে কাঞ্চন গাছটা ফুলে-ফুলে লাল হয়ে আছে কি না কে জানে? না থাকতেও পারে। তিনটে বছরও তো কম দিনের ব্যাপার নয়।

কিন্তু ফেরবার পথে ভোরের মানকর স্টেশনকে দেখতে সত্যই যে ভোরের স্বপ্নের মত মায়াময় বলে মনে হল। পঁচিশ বছর বয়সের বিজনবিহারীর চোখের আশাও যে আবার উতলা হয়ে উঠতে চাইছে। কাজলীকে দেখতে ইচ্ছে করে। শুধু একবার দেখা দিয়েই চলে আসা।

কিন্তু কাজলী কি এখন শিবপুকুরে আছে? থাকতেও পারে। কিন্তু থাকলেই বা কি?

কিছু নয়; কাজলী যদি সেদিনের মত কালো চোখের তারা ছুটোকে আবার হাসিয়ে কাঁদিয়ে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকায়, তবে একথা বলে দিতে পারবে বিজন, না কাজলী, আমার মনে একটুও ছুঃখ নেই। এই তিন বছর ধরে, একটি দিনও বাদ যায় নি, যেদিন তোমার কথা না ভেবে থাকতে পেরেছি। জংলী হাতী তাড়াবার সময় ক্যাম্পের কশন বেড়া পার হয়ে খড়ের গাদায় আগুন ধরাতে গিয়েও শুধু মনে পড়েছে, জংলী হাতীর কাছে যদি এখন প্রাণটা হারাতে হয়, তবু কাজলী কোন দিন জানতে পাবে না যে, মানুষটা মরবার আগে কাজলীরই কথা ভেবেছিল।

ট্রেন থেকে নেমে পড়ে বিজন। আর ট্রেন ছেড়ে যাবার পর বুঝতে পারে, চোখের আশা আবার পাগল হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখের সামনে একটা অলক্ষুণে শূন্যতাও চমকে উঠেছে। সেই কাঞ্চন গাছটা নেই।

শিবপুকুরের কাছারি বাড়ির নতুন সরকার মশাই ত্রিলোচনবাবুও একটু চমকে উঠেই বললেন, না, বটুক আর নেই। বটুকের স্ত্রীও নেই। দু'জনেই মারা গিয়েছে।

—বটুকবাবুর মেয়ে?

—সে অবশ্যি আছে। কিন্তু থেকেও নেই।

—কোথায় আছে?

—তার শ্বশুরবাড়িতে আছে। মেয়েটি এই এক বছর হল বিধবা হয়েছে।

—কেন?

—এ তো বড় আশ্চর্য প্রশ্ন! কেন মানে কি? একটা ক্ষয়-রোগী মানুষের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হয়, সে মেয়ে কতদিন সধবা থাকতে পারে?

—বটুকবাবুর মেয়ের শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

—গাঁয়ের নাম বেনুগ্রাম, দুবরাজপুর স্টেশনে নামতে হয়।

—শ্বশুরের নাম?

—তা জানি না। তবে শুনেছি, বটুকের বেয়াই হলেন নাম-করা দৈবজ্ঞী। বলেছিলেন বেয়াই, তুমি নাতির বিয়ে দেখে যাবে বটুক-বাবু; হুঁ!

—আচ্ছা, আমি যাই, নমস্কার।

—তুমি কে বট?

—আমি কেউ না।

কাজলীকে দেখবার জন্য চোখের আশা পাগল হয়েছিল, এইবার যেন চোখের জ্বালাটা পাগল হয়ে ওঠে। তুমি এ কেমন ঘর পেলে কাজলী? এমন ঘরের জীবন যে আমার ঘরছাড়া জীবনের চেয়েও

শূন্য জীবন। ভাগ্য আর আইন না হয় আমার জন্মের ভুল ধরে আমাকে অমানুষ বলে দাগী করে দিয়েছে, কিন্তু আইনের আর ভাগ্যের ভগবানেরা তোমাকে অমানুষ করে দিল কেন?

দুবরাজপুরের কাছেই বেনুগ্রাম, মাঝে শুধু তাঁতীদের একটা গাঁ পার হতে হয়। দৈবজ্ঞী বাড়িটা খুঁজে নিতে দেরি হয় না। বাড়ির কর্তা হাতের হুঁকো নামিয়ে রেখে আর চোখ বড় করে তাকান—কাজলী আবার কে?

বিজন বলে, শিবপুকুরের বটুকবাবুর মেয়ে।

কাশির বেগ চেপে কথা বলেন কর্তা, বল না কেন, নিরুপমা। যাই হোক···তুমি কে?

—আমি শিবপুকুর থেকে আসছি।

—বউমার দেশের লোক? বেশ কথা। কিন্তু তুমি এখানে এই দোর-গোড়াতেই দাঁড়াও বাপু। আমি বউমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কাজল এসেই হাসতে থাকে।—কাজলী, কাজলী করছিলে কেন? ও নামটা কি এখন আর আমাকে সাজে? না, তোমারও এই বয়সের মুখে সাজে? আমার নামটা যে নিরুপমা, সেটুকুও কোনদিন বোধহয় জানতে চেষ্টা কর নি?

বিজন হাসে: না, করি নি।

—ভালই করেছিলে; জেনেই বা লাভ কি?

—কেমন আছ?

—ভালই আছি। বিশজন মানুষের জন্যে দুবেলা ভাত রাঁধি আর বাসন মাজি।

—আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একটিও বাজে কথা বলতে পারব না। শুধু জানতে চাই···।

—চুপ কর। এটা আমার শ্বশুর বাড়ি।

—তোমার অভিশাপের বাড়ি।

—ছিঃ, ওকথা বলতে নেই।

—না বলে উপায় নেই। তুমিই না একদিন বলেছিলে···।

—কি বলেছিলাম ?

—বলেছিলে, তুমি ছাড়া আমার নাকি গতি নেই।

—একটা একরত্তি মেয়ের মুখের সেই কথাটা এখনও মনে করে রেখেছ ?

—মনে করে রেখেছি, আর সেই জন্যেই বলতে এসেছি।

—বল।

—আমি ছাড়াও তোমার গতি নেই !

—তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে এত ভয় দেখিয়ো না।

—ভয় ?

—এত লোভ দেখিয়ো না, তোমার পায়ে পড়ি।

—আমি তোমার কোন আপত্তি শুনব না।

সাদা থানে জড়ানো নিরুপমার রিক্ত মূর্তিটা থরথর করে কাঁপে।

—কি বলতে চাইছ, বল।

—আমার সঙ্গে চল।

—মাপ কর।

—না।

—তবে ভাবতে দাও।

—না। তোমাকে আমি চুরি করতেই এসেছি।

—ভাবতেও যে বুক কাঁপছে।

—কেন ?

—ভয়ে।

—কার ভয়ে ? কিসের ভয়ে ? ওই কেষ্টনগর আর বেনুগ্রামের ভয়ে ? আমি যাদের চোখে একটা অমানুষ, আর তুমি যাদের চোখে একটা দাসী, তাদের ভয়ে ? না, এখনি চল।

চোরের মত নয়, ডাকাতের মত কথা বলছে বিজনবিহারী। নিরুপমার সেই ভীরু চোখ দুটোও দেখে আশ্চর্য হয়, ডাকাতের চোখের জ্বালা জলে ভরে গিয়ে ছলছল করছে।

কিন্তু তখনই নয়। মাঝ রাতের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে একটা

ছায়াদস্যু যেন বেনুগ্রামের দেউলের কাছে অজগরের মাথার মাণিক লুট করবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। নিরুপমা আসে। নিরুপমার মাথাটা দুহাতে জড়িয়ে, নিরুপমার জলভরা ভীরু চোখ দুটোকে বুকের কাছে একবার চেপে ধরে শান্ত করে দিয়েই বিজনবিহারী বলে, চল ; কোন ভয় নেই নিরু।

॥ সাত ॥

শুধু বাঙালীবাবুর যত দুঃসাহসের কাণ্ড দেখে নয়, বাঙালীবাবুর এই জেনানারও সাহসের রকম-সকম দেখে আশ্চর্য হয় রামসিংহাসন। নতুন রেল-লাইনের জন্য মাটি কাটবার ঠিকে পেয়েছে নিতান্ত ছোকরা বয়সের এই বাঙালীবাবু, কিছু টাকা লাভ রাখে ঠিকই ; আর কাজের দায়ে দশ বিশ ত্রিশ মাইল দূরেও চলে যেতে হয়। কিন্তু সেজন্যে কি ভুলে গেলে চলে যে, সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফিরে আসা উচিত ? এই জঙ্গলের রাজ্যে সন্ধ্যাটাই যে সবচেয়ে ভয়ানক একটা লগ্নকাল ; ভুখা জানোয়ার তখন শিকার ধরবার জন্য মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করে।

কিন্তু বাঙালীবাবু সন্ধ্যা না হবার আগে ঘরে ফেরে না। বাঙালীবাবুর জেনানা, অল্পবয়সের ওই মেয়েটা, সারাটা দিন একা-একা ঘরের ভিতরে থেকে শুধু খুট-খাট ঠুং-ঠাং ধুপ-ধাপ কাজ করে। কাদা মাটি দিয়ে দেওয়ালের ফাটল জোড়া দেয়, গোবর দিয়ে আঙিনা নিকোয় ; কাঠের মুগুর দিয়ে ধানের তুষ ভাঙে আর কাটারি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কাঠ চেলা করে। আর, ঘর তো ওই একটা নড়বড়ে ঘর, যার দরজায় কাঠের কপাটও নেই, শুধু খেজুরপাতার একটা ঝাঁপ।

সন্ধ্যা হতেই দোকানঘরের টিনের ঝাঁপ নামিয়ে দিয়ে আর কেরোসিনের কুপির কাছে বসে, জীর্ণ তুলসী-রামায়ণটা হাতে তুলে নিয়ে এক-একদিন চমকেও ওঠে রামসিংহাসন। একটা নেকড়ে ঘরের চারদিকে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে ছুটছে। অথচ বাঙালীবাবু এখনও ঘরে ফেরে নি। বউটা একা-একা ঘরের ভিতরে বসে রান্না করছে।

—রাম রাম! ডরো মত্ দিদি। হাঁক দেয় রামসিংহাসন। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে, বাঙালীবাবুর বউ একটুও ভয় না

পেয়ে, উনুন থেকে জ্বলন্ত চেলাকাঠ তুলে নিয়ে অন্ধকারের ভিতরে লুকানো ওই খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দটার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছে।

যেমন এই বাঙালীবাবু তেমনই তার বউ, দুজনেই কি ভয়ানক বেপরোয়া হয়ে খাটতেও পারে! সড়কের ওপারে, একটু দূরে, কাঁচা-ইটের দেওয়াল তুলে বাড়িটা তৈরি করবার সময় বাঙালীবাবু তার মুণ্ডা মজুরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমানে কাজ করেছে। নিজেই ইটের ছাঁচ তৈরি করে নিয়েছে। নিজেও দুহাতে কাদা ঘেঁটে ইট গড়েছে। টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে শালের রোলা কেটেছে। সাত দিনের মধ্যে খুঁটো পুঁতে আর বাঁশ পেতে ঘরের ছাউনির ঠাট তৈরি করে ফেলেছে। ছাউনির উপর বসে খাপরা চেলেছে বাঙালীবাবু; বউটাও শক্ত করে কোমরে আঁচল জড়িয়ে, আর একটা চঙ্গের উপর দাঁড়িয়ে বাঙালীবাবুর হাতের কাছে খাপরা যোগান দিয়েছে।

নতুন ঘরে ঢুকে যেদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে নিরুপমা, সেদিন নিরুপমার আলোমাখানো মুখের হাসিটার দিকে তাকিয়ে বিজন-বিহারীর হৃৎপিণ্ডেরই একটা তৃপ্তি যেন হেসে ওঠে।

সন্ধ্যাটাকে সন্ধ্যা বলে মনে হয় না। বিজনবিহারীর নতুন অদৃষ্টের ঘরে যেন ভোরের আলো উঁকি দিয়েছে। এই তো সবে মাত্র শুরু হল। যা চাই, যা না হলে চলে না, তার সবই পেতে হবে। কারও কাছে ভিক্ষে করে নয়; বিজনবিহারী তার এই গায়ের আর এই প্রাণের জোরে সব আদায় করে ছাড়বে।

নিরুপমার হাত ধরে নতুন ঘরের দাওয়ার উপর বসে যখন গল্প করে হাসতে থাকে বিজনবিহারী, তখন সেই জংলী নিরালার বুকটাও যেন সঙ্গে সঙ্গে হাসতে থাকে। চৈত্র মাসের শালের কচি পাতাও নতুন বাতাসের ছোঁয়ায় ঝিরঝির করে নতুন হাসির শব্দ ছড়াতে থাকে।

ফেরারী আসামীর ভীরু হাসি নয়, ফেরারী অভিমানীর করুণ হাসিও নয়, যেন এক ফেরারী বিদ্রোহীর অনাহত প্রতিজ্ঞার হাসি।

পুরনো ভাগ্যটা যা কিছু কেড়ে নিয়েছে, নতুন ভাগ্যটা তার সবই কেড়ে আদায় করে ছাড়বে। দেখি, কার সাধ্যি আছে, বিজনবিহারীর এই ঘরের দিকে তাকিয়ে আর ঠাট্টার হাসি হেসে বলতে পারে, এটা একটা অদ্ভুত ঘর ?

রামসিংহাসন তো এর মধ্যে আশ্চর্য হয়ে গিয়ে তিনবার বলেছে, বাঙালীবাবুর ঘরনীর মত ঘরনী তো কাঁহুভি না দেখি। বনবাসিন সীতাজি যৈসন পতিপূজন লাগু···।

নিরুপমার সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোটা এই জংলী নিরালার বুকে সত্যিই একটা নির্ভয়ের আলোর সঞ্চার। তা না হলে হালুয়াই রামসিংহাসন, সরাইওয়ালা হীরারাম আর ভাঁটিদার গুলু মিয়া, তিনজনেই তিনটে মাস যেতে না যেতে দেশের বাড়ি থেকে বউ আনিয়ে ফেলতে সাহস পেত না। এখানে ঘর-সংসার করা যায়, এই বিশ্বাস যে এই বাঙালীবাবুর ঘরের আলোটাই ফুটিয়ে তুলেছে।

ক'বছরের মধ্যে যে অনেক কিছু পেয়ে গেল বিজনবিহারী। ঘরের গা ঘেঁষে চারটে শিউলি ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। ঘরটাও যে একটা নাম পেয়ে গেল—শিউলিবাড়ি। স্টেশনটারও নাম শিউলিবাড়ি। পাঁচ মাইল দূরে যে কোলিয়ারিটা প্রথম দেখা দিল, সেটারও নাম শিউলিবাড়ি কোলিয়ারি। মুণ্ডারা বলে, সিলুয়াড়ি কলিয়ারি। বিজনবিহারীর পুরনো নামটাকেও মাটি করে দিল একটা নতুন নাম—মাটিসাহেব। বেশ নাম। বিজনবিহারীর প্রাণের সেই প্রতিজ্ঞার স্বপ্নটা যে পাহাড় আজ শালবনে ঘেরা এই চমৎকার এক টুকরো জগৎটার মাটি দিয়ে সুখের ঘর তৈরি করে নিতে পেরেছে। এই মাটি বিজনবিহারীর স্বপ্নের বন্ধু ; বিজনবিহারীও এই মাটির স্বপ্নের বন্ধু।

যেমন শিউলিবাড়ির সড়কের দুপাশে, তেমনই স্টেশনের আশে পাশে কত নতুন ঘর উঠছে, নতুন দোকান বসছে। ঝুমরা রাজ এস্টেটের তশীলদার ফুলনবাবুও এসে একটি কাছারি বসিয়েছেন।

মাটিসাহেব সবারই দরকারের বন্ধু। সবাই মাটিসাহেবের ইচ্ছা উপদেশ আর পরামর্শের বন্ধু।

ধর্মশালা কমিটির প্রথম প্রেসিডেণ্ট বিজনবিহারী। সরাইওয়ালা হীরারাম স্টেশনে পানিপাঁড়ের কাজ নেবার পর সরাইটা বিনা যত্নের দুঃখে একেবারে ভেঙে গলে একটা ঢিপি হয়ে পড়েছিল। নতুন দোকানীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ইট কেনা হল, আর কাঠ কেনবার সব খরচ দিল বিজনবিহারী। পুরনো সরাইয়ের যত ধ্বংসের জঞ্জাল সরিয়ে নতুন ধর্মশালা তৈরি হতে শুরু হল যেদিন, সেদিনও রামসিংহাসন দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়, বাঙালীবাবু গাছতলায় দাঁড়িয়ে আর একটা করাত হাতে নিয়ে শাল কাঠের পাটা চিরছে। কারণ, দেওয়াল গাঁথবার জন্য ভারা বাঁধতে হবে, অথচ তক্তা নেই, আর কাঠুরে মিস্তিরিটাও আসে নি।

শিউলিবাড়ি রাস্তা কমিটিরও প্রথম প্রেসিডেণ্ট বিজনবিহারী। স্টেশন থেকে শুরু করে সড়কের মোড় পর্যন্ত প্রায় এক মাইল লম্বা যে রাস্তাটার দু'পাশে নতুন নতুন বস্তি, গোলা, দোকান আর আড়ত গড়ে উঠেছে, সে রাস্তাটা রাস্তাই নয়। বড় বড় গর্তে ভরা সে রাস্তায় চলতে গিয়ে গরুর গাড়ির ধড় মচকে যায়, চাকা ছিটকে পড়ে। শিউলিবাড়ির সব মানুষের কাছ থেকে মাসিক এক আনা চাঁদা নিয়ে রাস্তাটার উপর খোয়া বিছাই করতে হবে। তা ছাড়া, অন্তত চারটে ল্যাম্প পোস্টও বসাতে হবে।

শিউলিবাড়ি রক্ষা সমিতির প্রথম সেক্রেটারী মাটিসাহেব, সভাপতি তশীলদার ফুলনবাবু। কাগজ কলম হাতে নিয়ে নয়; পুরো তিনটে মাস রোজ রাতে লম্বা একটা বল্লম হাতে নিয়ে সেক্রে-টারীর কাজ করেছেন বিজনবিহারী। খবর পাওয়া গিয়েছে, বিরসা মুণ্ডার দল আবার ক্ষেপেছে। একটা দল নাকি এদিকে এসে তশীল কাছারি লুট করবে আর পোড়াবে। দোকানীরাও ভয় পেয়েছে, হামলা যদি হয়, তবে ওরাও কি রেহাই পাবে? স্টেশনটার উপরেও হামলা হতে পারে। ক্যাশব্যাগ বগলদাবা করে স্টেশন-মাস্টার

চৌধুরীবাবু রোজ রাতে এক ভিখিরী বুড়োর কুঁড়ে ঘরের ভিতর বসে-শুয়ে আর জেগে-ঘুমিয়ে রাত পার করে দেন। তশীলদার ফুলনবাবুও আতঙ্কিত হয়ে আবেদন করেন, একটা কিছু করুন মাটিসাহেব। আপনি না করলে করবে কে ?

পঁচিশ জন লোক, পঁচিশটা লাঠি আর পাঁচটা মশাল ; আগে আগে মাটিসাহেব বিজনবিহারীর বল্লমের ফলক মশালের আগুনের আভা লেগে চিকচিক করে। সারারাত টহল দিয়ে বেড়ায় রক্ষা-সমিতির পাহারা-পার্টি। অমাবস্যার মাঝরাতে তশীল-কাছারির উপর এক ঝাঁক তীরও ছুটে এসে পড়েছিল। কিন্তু বিজনবিহারীর দলের হাল্লা অমাবস্যার অন্ধকার কাঁপিয়ে দিতেই তীর-ছোঁড়া আক্রোশটা যেন আড়াল থেকেই ছুটে পালিয়ে গেল।

এক মাস পরে, দশ মাইল দূরের থানাতে গিয়ে ডি এস পি'র হাত থেকে একটি উপহার নিয়ে যেদিন শিউলিবাড়ি ফিরে এল বিজনবিহারী, সেদিনটা শিউলিবাড়ির জীবনেও যেন একটা মহোৎসবের দিন। পঞ্চাশ জন খুশী মানুষের একটা মিছিল, তার মধ্যে রামসিংহাসন আছে, গুলু মিয়াঁ আর হীরারামও আছে, দশ মাইল পথ বিজনবিহারীর পালকির সঙ্গে হেঁটে হেঁটে থানাতে গেল আর ফিরে এল। তশীলদার ফুলনবাবু নিজের হাতে পালকিটাকে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। রামসিংহাসন নিজের হাতে একটা মালা বিজনবিহারীর গলায় পরিয়ে দিয়েছিল।

শিউলিবাড়ি রক্ষা-সমিতির সেক্রেটারী বিজনবিহারীকে একটা একনলা বন্দুক উপহার দিয়েছেন সরকার। সেই জন্যেই সারা শিউলিবাড়ির বুকে এই আহ্লাদের উৎসব।

মিছিলটা যখন ফিরে এসে বিজনবিহারীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি হাঁকে—মাটিসাহেব কি জয়! তখন শিউলিবাড়ির রাতের আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে। যেন জ্যোৎস্নামাখা শিউলিবাড়ির অন্তরাত্মা জয়ধ্বনি হাঁকছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিরুপমার

চোখদুটোও যেন জ্যোৎস্না ছড়িয়ে হাসতে থাকে। ওই মানুষটা, নিরুপমার হাতে নিজের হাতে শাঁখা পরিয়ে দিয়েছে যে, তাকে যে সত্যিই মানুষের রাজা বলে মনে হয়। এই তো, মাত্র পাঁচটা বছর পার হয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে কেষ্টনগরের ভাগ্যহারানো ছেলে সত্যিই যে নিজের হাতে একটা সম্মানের রাজ্য তৈরি করে নিল।

মাটিসাহেব সেলাম! মাটিসাহেব আদাব! বন্দেগী মাটিসাহেব। সাইকেল চেপে আর বন্দুকটা পিঠে বেঁধে যখন সড়ক ধরে এগিয়ে যায় ত্রিশ বছর বয়সের বিজনবিহারী, তখন বুড়ো বুড়ো দোকানীও হাত তুলে অভিবাদন জানায়। স্টেশন মাস্টার চৌধুরীবাবুও বলেন —আপনি না থাকলে আমি এখান থেকে কবেই ট্রান্সফার নিতাম মাটিসাহেব। ক্ষেপা জংলীর তীরের ভয় মাথায় করে এখানে চাকরি করা আমার বুড়ো হাড়ে পোষাত না!

—না, আর ভয়টয় নেই। আপনি এখানে একেবারে নিশ্চিন্তি হয়ে থাকুন!

—কিন্তু ইয়েতেও যে পোষাচ্ছে না মাটিসাহেব। এই একরত্তি একটা ফ্ল্যাগ স্টেশন, শুধু কয়লাগাড়ি যায় আর আসে। কি ইনকাম হবে বলুন?

—হবে হবে। শিউলিবাড়ির এ অবস্থা চিরকাল থাকবে না। হেসে হেসে চৌধুরীবাবুকে যেন একটা আশ্বাস দিয়ে চলে যায় বিজনবিহারী।

চৌধুরীবাবু যদিও বাংলা কথা বলেন, কিন্তু বাঙালী নন, তিনি হলেন মুঙ্গেরী চৌধুরী। তা না হলে বিজনবিহারী এই চৌধুরীবাবুর সঙ্গে এরকম হেসে হেসে কথা বলতেন না। কথা বলতেনই কিনা সন্দেহ। অনেকদিন রাণীগঞ্জে ছিলেন চৌধুরীবাবু; বেচারা টাকা পয়সার হিসাবে কি-যেন একটা গোলমেলে কাণ্ড করে আর ধরা পড়ে এই জঙ্গলের ফ্ল্যাগ স্টেশনে শাস্তির বদলি নিয়ে এসেছেন। কে জানে কেন, বিজনবিহারীও বুঝতে পারে না, চৌধুরীবাবুর সঙ্গে যেন একটু মায়া করে কথা বলতে ভাল লাগে।

নিরুপমা বলে, সকলকেই তো ভরসার কথা শুনিয়ে বেড়াচ্ছ, শুধু আমার বেলায় ফাঁকি।

বিজনবিহারীর হাতটা নিরুপমার কাঁধের উপরে পড়ে আছে, চোখের সামনে শিউলি গাছটা দুলছে, আকাশ ভরে তারা গিজ-গিজ করছে; কথাটা বলে ফেলেই আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে নিরুপমা।

তারার আলোতে জোর না থাকুক, কিন্তু বিজনবিহারীর এই চোখের আলোতে বেশ জোর আছে। দেখতেও পায় বিজনবিহারী, নিরুপমা যেন আঁচল চাপা দিয়ে একটা অদ্ভুত বিহ্বলতার হাসি লুকিয়ে ফেলতে চাইছে।

—ফাঁকি? তোমাকে? বিজনবিহারীর গলার স্বরে যেন একটা নিরীহ বিস্ময় চমকে ওঠে।

—হ্যাঁ।

—বলেই ফেল, কিসের ফাঁকি?

উত্তর দেয় না নিরুপমা। শুধু চোখ তুলে বিজনবিহারীর মুখ-টাকে ভলে করে দেখতে চেষ্টা করে।

—বল।

নিরুপমা হেসে ওঠে, যাঁতা যাঁতা। কতবার বললাম, ছোট্ট একটা পাথরের চাক্কি যোগাড় করে দাও, নইলে ডাল ভাঙতে আর পারছি না। বড় যাঁতাটায় ডাল গুঁড়ো হয়ে যায়।

—তাই বল। আমি মনে করলাম আজ সকালে রামসিংহাসনের বউ এসে যে ফাঁকির কথাটা বলে গেল···।

চমকে ওঠে নিরুপমা। এই অন্ধকারের মধ্যেই বিজনবিহারীর চোখের ধূর্ত হাসিটাকে দেখতে পেয়েছে নিরুপমা। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমার মাথাটা যেন অলস হয়ে আর হেঁট হয়ে বিজনবিহারীর বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ে।

ঠিক কথা, আজই সকালে এসেছিল রামসিংহাসনের বউ বিন্ধ্যা-চলী। বোধহয় মনে করেছিল, বাঙালীবাবু বাড়িতে নেই; তাই

রান্নাঘরের দরজার কাছে বসে একেবারে মুখ খুলে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলেছিল বিন্ধ্যাচলী।—পাঁচ বছর ধরে তুমি কি শুধু ভাত খাচ্ছ দিদি? আর কিছু খাও না?

—কি বললে?

—আমার তো এই পাঁচ বছরে তিনটে হয়ে গেল। তুমি করছ কি?

—চুপ কর।

—না দিদি, দেখতে একটুও ভাল লাগে না। বাঙালীবাবুকে তুমি বড় ফাঁকি দিচ্ছ দিদি।

—চুপ কর। জান না, বোঝ না, শুধু যত বাজে কথা···।

বিন্ধ্যাচলী একটুও অপ্রতিভ না হয়ে আরও জোরে চেঁচিয়ে কথা বলে, তুমি কাজে দেখাবে, তবে তো আমি বাজে কথা বলব না। আহা, কেমন স্নুন্দর হত, যদি তোমার কোলে একটি ফুলফুলুয়া ভুলভুলুয়া টুপুল-টুপুল গোলগোল···।

—ছিঃ, চেঁচিয়ো না বিন্ধ্যাচলী।

বিজনবিহারী নিরুপমার হেঁট মাথাটা তুলে ধরে আবার একটা ধূর্ত হাসি হাসে, কিন্তু রামসিংহাসনের বউ তো বলে গেল, তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ।

সেই মুহূর্তে বিজনবিহারীর চোখের ধূর্ত হাসিটা যেন অপ্রস্তুত হয়ে চমকে ওঠে, করুণ হয়ে যায়। কেঁদে ফেলেছে নিরুপমা; দুচোখ থেকে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ে বিজনবিহারীর গেঞ্জির বুক ভিজিয়ে দিয়েছে।

—কি হল, নিরু? এর মানে কি?

—সত্যিই তোমাকে ফাঁকি দিলাম মনে হচ্ছে।

—তার মানে?

—তোমার ঘরে শুধু আমিই পড়ে থাকব, আর কেউ আসবে না।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী, পাগল কোথাকার? এমন বাজে কথা ভেবেও মানুষ মাথা খারাপ করে?

—না, একটুও বাজে কথা নয়। তুমি আমাকে ঘর দিলে, আর আমি তোমাকে ঘরের আনন্দ এনে দিতে পারলাম না ; আমার যে একটুও ভাল লাগছে না।

—ছিঃ, এসব কি বলছ? তুমি কি মরে গেছ, না, মরে যেতে বসেছ যে, এত হতাশ হয়ে কথা বলছ?

—সেই তো ভয়। যদি হঠাৎ মরে যাই, আর তোমার ঘরে কাউকে রেখে না যেতে পারি, তবে তুমি থাকবে কি নিয়ে? আমি যে হেসে হেসে মরতেও পারব না।

—আমি বলছি নিরু, এসব তোমার নিতান্ত মিথ্যে ভয়।

—আমার মাথা ছুঁয়ে বল : তুমি বললেই আমার সব ভয় মিথ্যে হয়ে যাবে।

সত্যিই নিরুপমার মাথাটা ছুঁতে হয়, তা না হলে বোধহয় আশ্বস্ত হবে না নিরুপমা।—আমি বলছি নিরু, কোন ভয় নেই।

—যাই হোক···। বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে, গা-মোড়া দিয়ে আর হাই তুলে, বুক টান করে আর হাত দুটোকে ঝাঁকুনি দিয়ে এপাশে-ওপাশে ছুঁড়ে, তখনি যেন একেবারে অন্যরকমের একটা মানুষ হয়ে গিয়ে হেসে ফেলে বিজনবিহারী।

নিরুপমাও জানে, এটা বিজনবিহারীর একটা কাজমাতাল চেহারা। সময় অসময়ের ধার ধারে না। ঘুম বিরাম ক্লান্তি কিছুই মানে না। কাজ করবার জন্য প্রাণটা যখন ছটফটিয়ে ওঠে, তখন ঠিক এই রকমের মূর্তি ধরে বিজনবিহারী।

—যাই হোক, তার আগে তোমার যাঁতাটা তো চাই। লণ্ঠনটা একবার নিয়ে এস নিরু।

—না, কখ্খনো না। এখন কোন কাজ নয়। তুমি এখন ঘুমোও গে।

দাওয়া থেকে নেমে, শিউলিতলায় জড়ো করা এক গাদা ছোট বড় পাথরের চাঙ্গড় থেকে ছোট্ট একটা চাঙ্গড় তুলে

নিয়ে এসে ব্যস্তভাবে বলে বিজনবিহারী, ছেনিটা আর হাতুড়িটা দাও।

না, আর বাধা দেবার কোন মানে হয় না। বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। বিজনবিহারীর দু'হাতের পেশী ও শিরা এখন রাত জেগে শুধু কাজ করবে ; কোন বাধা মানবে না।

ঠুক-ঠাক ঠুন-ঠান, ছেনি চালিয়ে আর হাতুড়ি ঠুকে এবড়ো-খেবড়ো পাথরটার চাকলা তুলতে থাকে বিজনবিহারী। আহত পাথরের কুচি জ্বলন্ত ফুলকি হয়ে ছিটকে পড়তে থাকে। বিজন-বিহারীর পাশে বসে হাতপাখা দোলায় নিরুপমা।

আকাশে আধখানা চাঁদ যখন দেখা দিয়েছে, শিউলির মাথা থেকে রাতের শিশির টুপ-টাপ করে ঝরতে শুরু করেছে, তখন কথা বলে বিজনবিহারী, এই নাও তোমার যাঁতা। কাল সকালে শুধু ফিনিস দিয়ে ছেড়ে দেব। তারপর যত ইচ্ছে ডাল ভেঙ্গ।

শুধু এই পাথুরে যাঁতাটা কেন, ঘরের ভিতরে কাঁঠাল কাঠের ওই খাট দুটোও যে বিজনবিহারীর নিজের হাতের কারিগরীর সৃষ্টি। করাত কাটারি ছেনি হাতুড়ি রেতি র‍্যাদা তুরপুন প্যাঁচকস—রাংতা-ঝাল, শিরীষ আঠা, সোহাগা—একটা প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুক যে বিজনবিহারীর কারিগরী কাজের যত সরঞ্জামে আর হাতিয়ারে ভরে আছে। আলনাটাকেও একদিনের মেহনতে তৈরি করেছিল বিজনবিহারী। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে এতগুলি মোড়া আর এই ডিজা-ইনের মোড়াও বিজনবিহারী নিজেই তৈরি করে নিয়েছে। তালের পাতা কেটে হাতপাখা তৈরী করতে নিরুপমাও জানে। কিন্তু খেজুর পাতার হ্যাট? এটা বিজনবিহারীর একটা সখের সাধনার সৃষ্টি। একগাদা খেজুর পাতা আর ছোট একটা ছুরি হাতে নিয়ে, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেন ধ্যানীর মত মন নিয়ে ভেবেছে বিজনবিহারী। এক মাসের চেষ্টার পর স্বপ্ন সফল হয়েছে। বাঁধনছাঁদন নেই, একটা গিঁটও দিতে হয় না, শুধু গুনে গুনে পাতা সাজাবার আর ভাঁজ করবার কায়দার জোরে চমৎকার হালকা একটা হ্যাট তৈরি হয়ে যায়।

—এ হ্যাট তোমাকেও চমৎকার মানাবে নিরু। কৃতার্থতার খুশীতে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠেছিল বিজনবিহারীর চিৎকারটা।

নিরুপমা বলেছিল, তুমি পরিয়ে দিলে মানাবে বইকি।

নিরুপমার মাথায় হ্যাট পরিয়ে দেবার সুযোগ অবশ্য পায় নি বিজনবিহারী; ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল নিরুপমা।

॥ আট ॥

দামোদরের উৎসটা খুঁজে বের করতেই হবে, আবার এক অদ্ভুত শখের প্রতিজ্ঞার কথা নিরুপমাকে শুনিয়ে দিয়ে যেদিন শিউলিবাড়ির এই ঘরের দরজা পার হয়ে চলে গেল বিজনবিহারী; খাকি কামিজ আর প্যাণ্ট, পিঠের উপর বাঁধা বন্দুকটা, মাথায় খেজুর পাতার হ্যাট —একটা কর্মঠ সুন্দরতা, একটা সুপুরুষ দুঃসাহস হেসে-হেসে সাইকেল চালিয়ে যখন সড়কের দু-পাশের যত গাছের ছায়ার ভিড়ের ভিতরে উধাও হয়ে গেল, তখন নিরুপমার বুকের ভিতরে একটা আক্ষেপ যেন ছটফটিয়ে মাথা কুটতে থাকে। ভুল হল, ভুল হল। বলে দেওয়াই ভাল ছিল। যেতে না দিলেই ভাল হত।

দামোদরের উৎসটা দূরের ওই মেঘ-মেঘ রঙের পাহাড়গুলোর কাছে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে, কে জানে কোন্ পাহাড়ের গায়ে? পায়ের কাছে, না বুকের কাছে, না মাথার কাছে, তাই বা কে জানে? ফুলনবাবু বলেছেন, ডেপুটি কমিশনার হার্বাট সাহেব একবার ক্যামেরা হাতে নিয়ে আর ঝুমরা রাজের হাতীর পিঠের উপর বসে ত্রিশ মাইল দূরের ওই পাহাড়গুলোর একটা ফটো তুলেই খুশী হয়ে গিয়েছিল: বাস্, হো গিয়া! দামোদরকা পোছিকা পাত্তা মিল গিয়া।

এই গল্প শোনবার পর থেকে বিজনবিহারীর মাথায় যেন একটা দুরন্ত শখের জেদ ভর করেছে, উৎসটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। বয়সটা তিরিশ পার হয়ে গেলই বা, বিজনবিহারীর এই জেদ যেন ছেলেমানুষের ঘুড়ি ওড়াবার জেদের চেয়েও দুরন্ত। বাধা দিলে কোন ফল হবে না।

বাধা দেওয়া উচিত নয়। কথাটা না বলে ভালই করেছে

নিরুপমা। মানুষটা সংসারের কারও স্বার্থের গায়ে একটা আঁচড়ও না দিয়ে কাঙালের মত কারও দয়ামায়াকে বিরক্ত না করে, শুধু নিজে শূন্য হয়ে আর রিক্ত ভাগ্যটাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে নিজের তৈরি একটা আনন্দের জগতে ইচ্ছামত খেলছে আর ছুটোছুটি করছে ; তাকে বাধা দেওয়া নিরুপমার জীবনের কাজ নয় ; তাকে বরং একটু যত্ন করে সাজিয়ে দেওয়াই যে নিরুপমার জীবনের সাধ।

নিরুপমার গায়ে হঠাৎ জ্বর এসেছে ; মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে, নিশ্বাসটা যেন পুড়ছে ; কিন্তু নিরুপমার চোখে-মুখে সেই জ্বরজ্বালার এক ছিটে ছায়াও ফুটে উঠতে পারে নি, ফুটে উঠতে দেয় নি নিরুপমা। জ্বরের জ্বালাটাকে জোর করে মনের মধ্যেই চেপে দিয়ে সারা সকালটা হেসে-হেসে আর ছুটোছুটি করে কাজ করেছে। উনুন ধরিয়েছে, রুটি তৈরি করেছে, আলু ভেজেছে। বিজনবিহারীর দু-বেলার ক্ষিদের খোরাক শালপাতায় মুড়ে নিয়ে নিজেরই হাতে সাইকেলের কেরিয়ারে বেঁধে দিয়েছে নিরুপমা।

সে সন্ধ্যায় নয়, মাঝ রাতেও নয় ; দরজার কাছে শেষ রাতেও কোন সাইকেলের ঘন্টি আর বেজে উঠল না। 'আমি এসেছি নিরু' বলে কেউ ডাকও দিল না।

জ্বরের জ্বালার চেয়েও দুঃসহ একটা দুঃস্বপ্নের জ্বালায় ছটফট করে নিরুপমা। অভিশাপের সাপটা বুঝি লখিন্দরের মাথায় এইবার ছোবল দিয়ে ফেলেছে।

না না না। কখ্খনো না। কোন অভিশাপের সাধ্যি নেই, কাজলীর ভালবাসার বিজুকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।—ও বিন্ধ্যা-চলী। এ রামসিংহাসনজী! ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে যখন উতলা আর্তনাদের মত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে নিরুপমা, তখন রাত ভোর হয়ে গিয়েছে।

দুটো দিন পার হয়ে যায়।

ফুলনবাবু চারজন লোক আর একটা টাট্টু ঘোড়া দিলেন ;

রামসিংহাসন আর গুলু মিঁয়া এই দলবল সঙ্গে নিয়ে ঝুমরা পর্যন্ত গিয়ে আর বিজনবিহারীর কোন খোঁজ না পেয়ে যে সন্ধ্যায় শিউলি-বাড়ি ফিরে আসে, ঠিক সেই সন্ধ্যাতেই থানার চৌকিদারের সঙ্গে আর চারজন জংলীর কাঁধে কাঁচা বাঁশের একটা ডুলিতে বসে দুলতে দুলতে বাড়ি ফিরে এল বিজনবিহারী।

বিজনবিহারীর খাকি কামিজটার গায়ে ছোপ-ছোপ রক্ত শুকিয়ে আছে ; কিন্তু মুখটা হাসছে।—এ দুটো দিন শুধু পাকা বটফল আর জল খেয়েছি ; কিন্তু দামোদরের উৎসটাকে খুঁজে বের করে ছেড়েছি নিরু।

বিজনবিহারীর গায়ের কামিজ দুহাতে খিমচে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে নিরুপমা : এ কি দশা করে ফিরে এসেছ ?

—ভালুকটা হঠাৎ পেছন থেকে এসে···কিছুই করতে পারে নি, পিঠটাকে একটু জখম করে দিয়েছে। ভালুকটাকে অবশ্যি এক গুলিতে সাবড়ে দিয়েছি।···কিন্তু একি ?

নিরুপমার কপালে গালে আর গলায় হাত রেখে রেখে আর চমকে চমকে প্রশ্ন করতে থাকে বিজনবিহারী, জ্বর ? সত্যিই কি জ্বর ? তোমার আবার জ্বর কেন হবে নিরু ?

—তুমি আগে কামিজ খোল। চেঁচিয়ে ওঠে নিরুপমা।

বিজনবিহারী যেন বিরক্ত হয়ে কামিজের পকেট থেকে, কে জানে কোন্ গাছের শিকড়ের একগাদা শুকনো ঝুরি বের করে নিয়ে বলে, আমার চিকিৎসা আমি জানি। কিন্তু তোমার···তোমার কি হল, কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

সত্যিই বুঝতে পারে নি, কল্পনাও করতে পারে নি বিজনবিহারী ; একদিন দুদিন, এক মাস দু'মাস, এক বছর দু'বছর ; পুরো দুটো বছরও পার হয়ে যাবে, তবু বুঝতে পারা যাবে না, নিরুপমার কেন জ্বর হল ? কোন্ অদৃষ্টের জ্বর ? কোন্ অভিশাপের জ্বর ?

জ্বরে ভুগতে ভুগতে তিনটে মাসের মধ্যে নিরুপমার শরীরটা শুকিয়ে পাকিয়ে কতটুকু হয়ে গেল !

কিন্তু বিজনবিহারীর চোখে যেন কোন আতঙ্ক নেই, উদ্বেগ নেই, এক ছিটে ভয়ের ছায়াও নেই। দু'চোখে যেন একটা জেদের আগুন শুধু দপ্ দপ্ করে জ্বলে আর কাঁপে। বিজনবিহারীর আত্মাটা যেন অসুর হয়ে খাটছে আর ছুটছে। জল গরম করে নিরুপমার জ্বরের শরীরটাকে ভাপস্নান করিয়ে আর ঠাণ্ডা জলে মাথাটাকে ধুয়ে দিয়েই বের হয়ে যায় বিজনবিহারী। ষোল মাইল দূরের মুণ্ডা গাঁয়ের ওঝার কাছ থেকে শিকড় বাকড় নিয়ে আসে; আসবার পথে মাইল তিনেক ওদিকে জঙ্গলের ভিতরে এগিয়ে মাটি-কাটার কাজটাও দেখে আসে।

রামসিংহাসনের বউ বিন্ধ্যাচলী যখন এক থালা ভাত আর এক বাটি কচুর তরকারি নিয়ে এসে নিরুপমার নীরব রান্নাঘরের দরজার কাছে রাখে, তখন দেখতেও পায় বিন্ধ্যাচলী, বাঙালীবাবু এরই মধ্যে সাগু জাল দিয়ে ফেলেছে; সাগুর বাটি দু'হাতে তুলে নিয়ে নিরুপমার মুখের কাছে ধরে রেখেছে।

কি আশ্চর্য, বাঙালীবাবুর বউয়ের প্রাণটা যেন রান্নাঘরের এই দরজারই কাছে পড়ে আছে। শুনতে পায় বিন্ধ্যাচলী, দুর্বল পাখির বাচ্চার ডাকের মত চিঁ-চিঁ করে বিন্ধ্যাচলীকে একটা অনুরোধের কথা বলছে নিরুপমা।—বাবুর তরকারিতে হিং-টিং দিয়ো না বিন্ধ্যাচলী। কেমন?

—দিব না।

চলে যায় বিন্ধ্যাচলী।

বিজনবিহারী বলে, ঝুমরা রাজ আমার একটা কথা রেখেছেন।

—কি?

—শিউলিবাড়িকে একটু বাড়িয়ে তুলতে হবে।

—কি বললে?

—স্টেশনের পুব দিকের শালজঙ্গল সরিয়ে যদি বাড়ি তৈরির মত ছোট বড় দু'চারশো প্লট করা যায় তবে বাইরে থেকে অনেক ভাল লোক এখানে এসে বাড়ি করবে বলে মনে হয়। এরকম ভাল জল-হাওয়া তো যেখানে-সেখানে আর সহজে মেলে না।

—কি বললেন ঝুমরা রাজ ?

—রাজি হয়েছেন। শিউলিবাড়ি কোলিয়ারির বাবুরা এখনই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বাড়ি তৈরির জমি চাইছেন।

—ভাল কথা।

—আমিও ঠিক করেছি নিরু, তুমি সেরে উঠলেই, এ-ঘরের লাগাও দক্ষিণে পাকা ইটের দুটো নতুন ঘর তৈরি করব।

নিরুপমার শুকনো সাদা ঠোঁটে একটা করুণ হাসির শীর্ণ ছায়া সিরসির করে।—এখনই শুরু করে দাও, আমার অসুখ কবে সারবে কে জানে ? সারবে কি সারবে না, তাই বা কে জানে ?

বিজন বলে, সারবে না মানে ? তুমি বাজে কথা বলবে না নিরু।

নিরুপমা তবু হাসে : তার মানে, তুমি আমাকে সারিয়ে ছাড়বে ?

—নিশ্চয়।

এক পাঁজা ইট পুড়িয়ে ফেলেছে বিজনবিহারী। দক্ষিণের ঘর দুটোর নক্সাও এঁকে ফেলেছে। ওদিকে, স্টেশনের পুব দিকের শাল-জঙ্গলও অনেকখানি সাফ হয়ে এসেছে। একশো ছত্তিশগড়ী কুলি আনিয়ে জঙ্গল কাটতে শুরু করে দিয়েছেন ঝুমরা রাজের তশীলদার ফুলনবাবু। মাটি ফেলে রাস্তা তৈরি করছে মাটিসাহেবের মুণ্ডা মজুরের দল।

এরই মধ্যে আরও কত কাজ সেরে ফেলতে পেরেছে বিজন-বিহারী। ঝুমরা রাজের সঙ্গে গাঁয়ের মুণ্ডাদের ঝগড়াটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে চলেছিল। মুণ্ডা চাষীরা জমিতে পাকা রায়তী স্বত্ব চায়। খাজনার রেট কমাতে চায়। সালিয়ানা দিতে না পারলেও এক কথায় মুণ্ডা চাষীর হালিয়তী জমি কেড়ে নেওয়া চলবে না।

দুই পক্ষই শেষে মাটিসাহেবকে সালিশ মেনেছে। মাঝামাঝি একটা রফা করে দিয়েছে বিজনবিহারী। না, হালিয়তী জমিকেও রায়তী জমি বলে মেনে নেবেন ঝুমরা রাজ। নগদ টাকার সালিয়ানা দিতে পারবে না যে, সে শুধু জঙ্গল কাটবার কাজে কিছু দিন খেটে দিলেই সালিয়ানা শোধ হয়ে যাবে। ঝুমরা রাজ চেয়েছিলেন, জঙ্গল কাটবার মজুরী হবে এক আনা ; মুণ্ডারা চেয়েছিল চার আনা। বিজনবিহারী রফা করে দিয়েছেন—দুই আনা।

রাঁচির দুজন বিদ্বান ভদ্রলোক জানতে পেরেছেন, শিউলিবাড়িতে মাটিসাহেব নামে সাহসী এক ভদ্রলোক থাকেন। এক গাদা নানা-রকমের পাথরের নমুনা নিয়ে আর একটা চিঠি নিয়ে রাঁচি থেকে পি এন বসুর লোক বিজনবিহারীর কাছে এসেছিল। শিউলিবাড়ির উত্তরের জঙ্গলটার আট মাইল ভিতরে ঢুকে আর দুধিয়া নামে নদীটার দু'পাশের যত অদ্ভুত-অদ্ভুত পাথরের টুকরো একটা গরুর গাড়িতে

বোম্বাই করে রাঁচি পাঠিয়ে দিয়েছে বিজনবিহারী। ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন পি এন বসু ; লিখেছেন, এরকম পাথরের আরও কিছু নমুনা পাঠাবেন।

রায় বাহাদুর শরৎ রায়ের চিঠি নিয়েও লোক এসেছিল।— মুণ্ডাদের গাঁয়ে একটু খোঁজ করে দেখবেন, আর মাটি কাটাবার সময়েও একটু লক্ষ্য রাখবেন, পাথরের তৈরি কোন কুড়ুল বা টাঙ্গি বা যে-কোন রকমের হাতিয়ার পাওয়া যায় কিনা।

ঠিকই, সিলুয়াডির মুণ্ডা গাঁয়ের কাছে, আড্ডিকেলে একটা মশান পাথরের কাছে তেঁতুলগাছের নীচে তিনটে পাথুরে কুড়ুল দেখতে পেয়েছিল বিজনবিহারী। লক্ষ বছর আগের পাথুরে কুড়ুল বোধহয়। সেই পাথুরে কুড়ুল পেয়ে রায় বাহাদুর শরৎ রায় ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন : অনুগ্রহ করে আরও খোঁজ করবেন।

ঘরের বাইরে এত ধন্যবাদ ; কিন্তু ঘরের ভিতরে নিরুপমার চোখ দুটো যেন নিবু নিবু দুটো দীপশিখা ; বিছানার উপর পড়ে আছে শোলার পুতুলের মত হালকা একটা করুণ শরীর। এক বছরের জ্বরটা এখনও যেন নিরুপমার পাঁজরের আড়ালে ধুকপুক করছে। তা ছাড়া, আর-একটা শত্রু, আমাশা, নিরুপমাকে রক্তহীন করে যেন হাড়মাংসের এক মুঠো সাদা ছোবড়া করে বিছানার উপর ফেলে রেখে দিয়েছে।

বিজনবিহারী যখন থানকুনি পাতার ঝোলের বাটিটা নিরুপমার মুখের কাছে তুলে ধরে, তখন নয় ; যখন নিরুপমাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে থাকে বিজনবিহারী, তখনই নিরুপমার সেই নিবু-নিবু চোখ দুটো যেন বড় হয়ে হেসে ওঠে।

বিন্ধ্যাচলীও আড়াল থেকে আর কোন শব্দ না করে কেঁদে কেঁদে চলে গিয়েছে ; নিরুপমাকে কোলে করে তুলে নিয়ে ওদিকের ছোট ঘরের ভিতরে চলে গেল বাঙালীবাবু। উপায় তো নেই, নিরুপমার যে আর নড়ে বসবারও সাধ্যি নেই।

বিকেল হলে, বাঙালীবাবু যখন বাড়িতে থাকে না, তখনও এসে

দেখতে পায় বিন্ধ্যাচলী, চোখ বন্ধ করে অসাড় হয়ে পড়ে আছে নিরুপমা। কিন্তু বাঙালীবাবু এত কাজের মধ্যেও একটা কাজ ভুলে যায় নি ; নিরুপমার মাথার রুক্ষ চুলের বোঝাটাকে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে আর ঢিলে করে একটা খোঁপা বেঁধে দিয়ে, সিঁথিতে টাটকা সিঁদুর বুলিয়ে দিয়ে, তবে বাইরের কাজে বের হয়ে গিয়েছে বাঙালীবাবু।

ত ার ফুলনবাবু একবার বলেছিলেন, মাটিসাহেবের স্ত্রীকে রাঁচিতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে ভাল হত। কিন্তু আক্ষেপও করেছিলেন, এখন আর সেটা সম্ভব নয়। রামসিংহাসন যা বলছে, তাতে তো মনে হয় যে মোটরবাসের একটি ঝাঁকুনিতেই মহিলার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। আর, মোটরবাসেরও যা চেহারা আর যা মতিগতি! আধমাইল গিয়েই হয়তো চাকাভাঙা হয়ে তিন ঠ্যাং-এর উপর দাঁড়িয়ে থাকবে ; পাঁচ-সাত-দশ ঘণ্টার মধ্যেও আর নড়বে না। তা ছাড়া, ষাট মাইলের পর দারু-চটিতে বাস বদলও আছে। সারা রাতটা সেখানে পার করে দিয়ে পরের দিন সকাল আটটায় রাঁচির বাস ধরতে হয়। সে বাসও রোজ সকাল আটটায় ছাড়ে না। মুচি আসে, ফাটা টায়ার তালি দিয়ে সেলাই করে ; হাওয়া ভরতে হয়তো আরও দুটো ঘণ্টা। তারপর রওনা হয় বাস, যদি স্টার্ট নিতে ইঞ্জিন আর দেরি না করে। এই অবস্থায়···না, মাটি-সাহেবের স্ত্রীকে এখন রাঁচি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও নিরাপদ নয়।

বিজনবিহারী জানে, শুধু এখন কেন, তখনও নিরাপদ ছিল না, যখন নিরুপমার জ্বরের শরীরটা কাহিল হয়েও উঠতে বসতে আর একটু হাঁটাহাঁটিও করতে পারত। শিউলিবাড়ির বাইরের পৃথিবীটা যে বড়দা আর মেজদার সম্পত্তি ; বেনুগ্রামের দৈবজ্ঞীর শাস্ত্র ; মেজমামা আর উকীলবাবুর আদালত। ঠাট্টা ঘেন্না আর অপমানের জগৎ। নিরুপমাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না বিজনবিহারী, এক মুহূর্তের জন্যেও না। হাসপাতালের খাতা প্রশ্ন করবে, কে আপনি ? পিতার নাম কি ? উনি কি আপনার স্ত্রী ?

কতদিন বিবাহিত ? কতগুলো গিধ আর শকুন যেন বিজনবিহারীর মনুষ্যত্বের প্রাণটাকে ঠুকরে ঠুকরে প্রশ্ন করবে। হয়তো ডাক্তারটা চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করে বসবে, আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে ? কিংবা, নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা নার্স বলে বসবে, বেনুগ্রামে আমার এক মামী ছিলেন, ঠিক আপনার মত দেখতে ! না, ও জগতের ধারে-কাছেও আর নয়।

শিউলিবাড়ির আলো-বাতাসেরও প্রাণের সব জোর কি ফুরিয়ে গেছে ; নিরুপমার কাহিল প্রাণটাকে টেনে তুলতে পারবে না ? গরীব ওঝার বিশ্বাসের ঝুলির যত শিকড়-বাকড় সবই মিথ্যা, সত্য শুধু ওই ওদের হাসপাতালের ওষুধ ?

না, বিশ্বাস করে না বিজনবিহারী। বিশ্বাস করতে পারবেও না। নিরুপমা যদি···না, তবুও বিশ্বাস করবে না বিজনবিহারী।

সেদিন অনেক রাতে শালের জঙ্গলের ঝড়টা শান্ত হয়ে যেতেই শিউলিবাড়ির অন্ধকার যেন সব ঝিঁঝিঁর ডাক চুপ করিয়ে দিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। শিউলিতলায় একটা শুকনো পাতাও উসখুস করে না।

নিরুপমার শিয়রের কাছে বাতিটাকে একটু উস্‌কে দিয়ে আর দুই চোখ অপলক করে নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিজনবিহারী। হিক্কাটা আস্তে আস্তে যেন মৃদু হয়ে আসছে।

সন্ধ্যার একটু পর থেকে শুরু হয়েছে, নিরুপমার ওই হিক্কার শব্দটা। কী হিংস্র একটা ঠাট্টার শব্দ ! একটা শাস্তির গর্ব যেন বিজনবিহারীর বুকে ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়ে হাসছে আর কথা বলছে ; শিউলিচোর ! শিউলিচোর ! একটা অমানুষ হয়ে বাংলাদেশের শিউলি চুরি করে নিয়ে এসে এই জঙ্গলের ভেতরে সুখের ঘর করবে ? খুব যে সাহস দেখিয়েছিলে বিজনবিহারী ?

বিজনবিহারীর দুঃসাহসের বুকটাকে ঘিরে আর চোখ পাকিয়ে যেন কথা বলছে কেষ্টনগর আর বেনুগ্রামের অভিশাপ। এ-ঘর আর ও-ঘর, কখনও বা একেবারে ঘরের বাইরে বারান্দায়, ছুটোছুটি

করে ঘুরতে থাকে বিজনবিহারী। চোখ ছুটো যেন মাথার ভিতরের একগাদা পাগল রক্তের চাপ সহ্য করতে না পেরে লাল হয়ে ফুটতে থাকে।

ওই ত বন্দুকটা পড়ে আছে। টোটার মালাটাও কাছেই আছে। নিরুপমার কানের কাছে ফিসফিস করে এখনি বলে দিতে পারা যায়ঃ কোন ভয় নেই নিরু; তুমি হেসে হেসে আমার হাতেই মরে যাও; অভিশাপটার হাতে মরো না। ও অভিশাপের হাতে তোমাকে মরতে দেব না। এখুনি···।

হঠাৎ চোখ মেলে আর কি-অদ্ভুত একটা জ্বলজ্বলে অথচ ছটফটে একটা দৃষ্টি তুলে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিরুপমা। নিরুপমার একটা হাতের উপর হাত রেখে আস্তে আস্তে ডাকে বিজনঃ কি নিরু?

—না, তোমাকে একা রেখে, তোমার ঘর খালি রেখে আমি মরতে পারব না। চেঁচিয়ে ওঠে নিরুপমা; নিরুপমার ধুকপুকে বুকের ভিতর থেকে যেন সমস্ত শক্তি নিয়ে একটা দুর্বার পিপাসা চেঁচিয়ে উঠেছে।

বিজনবিহারীরও প্রাণটা যেন চিৎকার করে ওঠে।—না, কখ্‌খনো না; তুমি মরতে পারবে না, নিরু।

নিরুপমা বলে, ভগবান আমাকে বাঁচাতে চায় না। ভগবান আমাকে বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু তুমি পারবে; তুমি আমাকে বাঁচাও, লক্ষ্মীটি!

—নিশ্চয় বাঁচাব।

—একটু কাছে এস।

নিরুপমার কপালের উপর মুখটাকে উপুড় করে পেতে দিয়ে যেন একটা ধীর স্থির ও শান্ত স্বপ্নের স্নেহ হয়ে বসে থাকে বিজন-বিহারী।

—ঘুমোও নিরু! নিরুপমার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলায় বিজনবিহারী। ওঝা বলেছে, ডান হাতের চার আঙুল দিয়ে

মাথাটাকে ডান থেকে বাঁয়ে শুধু একটু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে বুলিয়ে দিলে জাদু তাড়াতাড়ি জাগে।

ঘুমিয়েছে নিরুপমা। নিরুপমার কপালটাও ঘামে ভিজে গিয়েছে। ভোরের পাখিও ডেকে উঠেছে। নিরুপমার কপালের ঘাম মুছে দিয়ে পাখার বাতাস দিতে থাকে বিজনবিহারী।

চোখ মেলে তাকায় নিরুপমা; আর শালের কচিপাতার উপর ভোরের আভার মত একটা লালচে হাসির আভা যেন নিরুপমার সাদা ঠোঁটের উপর ফুটে উঠে।—শুনছ?

—কি নিরু?

—মাথার জ্বালাটা সত্যিই যে নেই বলে মনে হচ্ছে।

পূজা পূজা পূজা! সকালবেলাতেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রামসিংহাসনকে তাগিদ দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে বিন্ধ্যাচলী। বাঙালীবাবুর বউয়ের উপর পিশাচের যে নজর পড়েছিল, সে নজর ছুট গইল বা। মিছরি বেল আর জবা ফুল নিয়ে রামসিংহাসনকে এখনই রওনা হতে হবে; দশ মাইল দূরে দামোদরের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

॥ দশ ॥

একটা সিমেণ্টের কারখানা নাকি শিগগিরই চালু হবে। সিংভূমের রাখা মাইনস্ থেকে দু'জন সাহেব এসেছিলেন। মাটিসাহেবের ডাক পড়েছিল। দুধিয়া নদীর দু' পাশের পাথুরে ডাঙ্গায় এদিকে-ওদিকে সাহেবদের সঙ্গে তিনটে দিন সারাবেলা ঘুরে বেড়িয়েছে বিজনবিহারী। কৃতজ্ঞ সাহেবরা যাবার সময় বিজনবিহারীকে একটা জিনিস উপহারও দিয়ে গেলেন—একটা গ্রামোফোন, আর এক ডজন রেকর্ড; এক ডজন বিলিতী বাজনা আর বিলিতী গান। বাংলা গানের রেকর্ড হলে বোধ হয় এই উপহার ছুঁতেও চাইত না; ছুঁতে পারতও না বিজনবিহারী।

শিউলিবাড়ির ইতিহাসেও এটা একটা রেকর্ড; প্রথম কলের গান বাজল। এই বিস্ময়ের গান শোনবার জন্য বিজনবিহারীর বাড়ির বারান্দার কাছে একটা ভিড়ও জমে উঠেছিল। এমন কি, গুলু মিয়াঁর বউ, যে মানুষটা ঘরের বাইরে একটা গাছের দিকেও উঁকি দিতে চায় না, সে-মানুষও ছেলে কোলে নিয়ে আর নিরুপমার কাছে বসে কলের গান শুনে চলে গেছে।

তশীলদার ফুলনবাবুও একদিন জানিয়েছেন, দেড় শো প্লট বিক্রী হয়ে গিয়েছে।

—কিনলে কারা?

—কিছু প্লট রাঁচির মারোয়াড়ীরা কিনেছে। কিছু কিনেছে গোমোর ফিরিঙ্গী সাহেবরা। ঝুমরা রাজের রাজপুত কুটুমেরাও কিছু কিছু কিনেছে।

—খুব ভাল হয়েছে। যেন একটা স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে বিজনবিহারী। কোন বাঙালী যে একটাও প্লট কেনে নি, এটা যেন বিজনবিহারীর জীবনের কাছে একটা আশ্বাসের সংবাদ।

তিনটে বছরের মধ্যে শিউলিবাড়ির বাজারটাও বেড়েছে। কোথা থেকে অচেনা-অজানা এক শিখ সর্দার একদিন শিউলিবাড়িতে এসে মাটিসাহেবেরই সঙ্গে রোজগারের উপায় আলোচনা করেছিল, পরামর্শও চেয়েছিল। সর্দার স্নুচেত সিং। ঝুমরা রাজের একটা জঙ্গলকে লীজ পাইয়ে দেবার জন্য স্নুচেত সিংকে সঙ্গে নিয়ে বিজনবিহারী তিনদিন ঝুমরা রাজের বড় কুমারের সঙ্গে দেখা করেছিল। লীজ পেয়েছিল স্নুচেত সিং। স্নুচেত সিংএর কাঠের গোলাটা এখন লম্বায় প্রায় আধ মাইল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নানা নতুনের আবির্ভাবে ভরে উঠছে ছোট্ট শিউলিবাড়ি। স্টেশন মাস্টার চৌধুরীবাবুর মুখেও একটা নতুন হাসির আবির্ভাব দেখা যায়।

—একটা স্নুখবর আছে মাটিসাহেব। এ লাইনে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন নাকি চালু হবে।

—তাহলে আপনার একজন অ্যাসিস্টেণ্টও হবে নিশ্চয়।

—ওটাই তো ভাবনার কথা মাটিসাহেব। যদি ভাল লোক হয়, তবে ইনকামের শেয়ার নিয়ে হয়তো তেমন কিছু খিটিমিটি বাধাবে না। কিন্তু যদি না হয়, তবে ?

আর, নিরুপমার মুখের দিকে তাকালে যে সব চেয়ে স্নুন্দর নতুনের আবির্ভাবের হাসিটাকে দেখতে পাওয়া যায়! নিরুপমার মুখের উপর যেন রাঙা জবার আলো ফুটে উঠেছে। শরীরটাও কী স্নুন্দর স্বাস্থ্যে ভরে গিয়েছে। রামসিংহাসনের বউ হিসেব করে দিন গুনছে।

—ছি ছি, এ কি করছ ? এখনই এসব কেন ? বিন্ধ্যাচলী দেখতে পেলে যে তোমার নামেও যা-তা বলে ঠাট্টা করবে। নিরুপমা দু'বার এসে বাধা দিয়েছে আর হেসেও ফেলেছে।

সেগুনের একটা পাটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে, আর করাত হাতুড়ি র‍্যাদা নিয়ে দু'দিন ধরে যে কাণ্ডটা করে চলেছে বিজনবিহারী। সেটা বিন্ধ্যাচলী এখনও দেখতে পায় নি। দেখে থাকলেও বুঝতে পারে নি। একটা দোলনা তৈরি করছে বিজনবিহারী।

বিজনবিহারী বলে, যা-তা আর কি বলবে রামসিংহাসনের বউ ? বড় জোর বলবে, ভুখা বাঙালী।

—কথাটা তাহলে সত্যি।

—নিশ্চয়।

ভুখ, ঠিক কথা, একটা স্বপ্নের ভুখ যেন এতদিনে একটা আশার আশ্বাসে বিভোর হয়ে বিজনবিহারীর চোখ দুটোকেও নিবিড় করে তুলেছে।

সেই সন্ধ্যাতেই, যখন বারান্দায় কেরোসিনের আলোর কাছে বসে বুরুশ চালিয়ে দোলনার ফ্রেমে গালা বার্নিশ লেপতে শুরু করেছে বিজনবিহারী, তখন ঘরের ভিতর থেকে উতলা হয়ে ছুটে এসে হাঁপাতে থাকে নিরুপমা : বিন্ধ্যাচলীকে এখনই ডেকে দাও।

—বিন্ধ্যাচলীকে কেন ?

—একলা হয়ে পড়ে থাকতে যে বড় ভয় করছে। শিগগির ডেকে দাও।

—কোন ভয় নেই ; আমি আছি। রামসিংহাসনের বউকে ডাকবার কোন দরকার নেই।

তিন ক্রোশ দূরে কাট্‌কি জঙ্গলের বস্তিতে যে চামারিন বুড়িটা থাকে, সিধো চামারের মা, তাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। বুড়িটা রামসিংহাসনের বাড়িতেও দু'বার ধাইয়ের কাজ করেছে। কিন্তু এক মাস ধরে কাট্‌কিতে বাঘের হামলা চলেছে। তাই বোধ হয় আসতে পারে নি বুড়িটা।

কিন্তু বিজনবিহারীর মনটা সেজন্য একটুও দুশ্চিন্তিত নয় ; বিজনবিহারীর হাত দুটো আজ যেন ইচ্ছে করে এক পরম কারিগরীর কাজ করে ধন্য হতে চায়। একটা শিউলি-কুঁড়িকে শুধু দু' হাত পেতে তুলে নেওয়া ; আর নাড়ি কেটে ধোওয়া-মোছা করে নিরুপমার বুকের কাছে শুইয়ে দেওয়া।

বড় শান্ত আর বড় স্নিগ্ধ রাত্রি। এক ঘণ্টাও সময় লাগে নি ; নিরুপমার শরীরটা যখন সব যন্ত্রণার ভার থেকে মুক্ত হয়ে একটা

স্নিগ্ধ তন্দ্রার ঘোরে শান্ত হয়ে পড়ে থাকে, তখন নিরুপমার কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেয় বিজনবিহারী, যেন একটা স্নিগ্ধ জয়রব ঃ নিরু, তোমার মেয়ে। আর, নিরুপমার চোখদুটোও তাকাতে গিয়ে যেন বিস্ময়ের সুখে হেসে ফেলে।

যখন দূরে খেজুর গাছের কাছে একটা ল্যাম্পের আলো দপ্‌দপ করে জ্বলে, আর শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে বিজনবিহারী, তখন বাঙালীবাবুর বাড়িতে নতুন আবির্ভাবের কান্নার স্বর শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে বিন্ধ্যাচলী।

—বেটি ভইল বা। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খুশীর হাসি ছড়িয়ে চলে যায় বিন্ধ্যাচলী; আর বিজনবিহারীও ফিরে এসে হাত ধুয়ে নিয়ে শিউলি-তলার পাথরটার উপর শান্ত হয়ে বসে। রামসিংহাসনের বাড়িতে তখন ঢোলক বাজতে শুরু করেছে।

কে বাজাচ্ছে? রামসিংহাসন? না, রামসিংহাসনের বড় ছেলেটা?

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে কান পেতে থাকলে ঢোলকের শব্দটাকে বড় অদ্ভুত শোনায়। যেন আকাশে ঢোলক বাজছে। প্রয়াগের ধর্মশালার সেই সাধুটা ধুনীর আগুনের কাছে বসে গল্প করতে করতে বলেছিল, যখন পৃথিবীতে কোন পুনীত প্রাণ জন্ম নেয়, তখন আকাশমে দুন্দুভিনাদ হোতা হ্যায়।

ঢোলকটা বাজছে বিজনবিহারীর বুকের আকাশে। সত্যিই যে মনে হচ্ছে, মস্ত একটা পুণ্যির প্রাণ জন্ম নিয়েছে। এই তো ওখানে, ওই ঘরে, নিরুপমার বুকের কাছে ঘুমিয়ে আছে। এতক্ষণে কান্না থামিয়েছে।

চোখ মেলে আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে চারদিকে তাকায় বিজনবিহারী। কপালের উপর আস্তে আস্তে হাত বোলাতে থাকে। যেন হাত বুলিয়ে ভাগ্যেরই একটা বিস্ময়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করছে বিজনবিহারী।

মনটাই বা হঠাৎ এত শান্ত হয়ে গেল কেন? এ-মনে এক ছিটেও

রাগ নেই ; আর প্রাণটাও যেন কারও উপর রাগ পুষে রাখতে চাইছে না, পারছেও না।

জেদটার সব ঝাল মিটে গিয়েছে। আর জেদটাও যেন একটু লজ্জা পেয়েছে। তাই বোধ হয় বুকের ভিতরে একটা গর্বের সুখ লাজুক তারার মত মিটিমিটি হাসছে।

কিন্তু সেজন্যে এত শান্ত হয়ে যাবে কেন মনটা ? না, সেজন্যে নয়। মনে হয়, অভিশাপ নয়, মস্ত বড় একটা আশীর্বাদ যেন হাত তুলে একটা লগ্নের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। বিজনবিহারীর কপালটাকে আজ ছুঁয়ে ফেলেছে সেই আশীর্বাদের হাত। তা না হলে, বাংলা দেশের শিউলিতে এরকম একটি কুঁড়ি ফুটবে কেন ? বিজনবিহারীর আশার ঘর এমন একটা উপহার পেয়ে যাবে কেন ?

নিরুপমা যে বাংলা দেশের একটা গোপন দান। শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবকে একটা ফেরারী আসামীর গা-ঢাকা জীবন বলে মনে করবার কোন মানে হয় না। বিজনবিহারী যেন মিথ্যে রাগ করে নিজেরই বিরুদ্ধে একটা মিথ্যে অভিযোগের মামলা দায়ের করেছিল। বাংলা দেশের শিউলি চুরি করে নি বিজনবিহারী। কেষ্টনগর শিবপুকুর আর বেনুগ্রাম, যেন তিনটি ভীরু-মায়ার প্রাণ, শুধু একটা চক্ষুলজ্জার ভয় ছিল বলেই খিড়কির দরজার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে বিজনবিহারীর হাতে একটা মায়ার দান ঢেলে দিয়েছিল। ছিঃ, এতদিন ধরে ভুল করে কার উপর রাগ পুষে এসেছে বিজনবিহারী ?

—কি ব্যাপার? মাটিসাহেব যে একেবারে মাটির মানুষ হয়ে গেল দেখছি। কথাটা বলেই মুখ টিপে হাসতে থাকে নিরুপমা।

নিরুপমার এই মুখ-টেপা হাসিটা একটা মিষ্টি বিস্ময়ের হাসি নিশ্চয়; কিন্তু একটা মিষ্টি চিমটির হাসিও বটে।

সূর্য উঠতে না উঠতে যে মানুষটা তড়বড় করে দুটো রুটি চিবিয়ে আর জল খেয়ে সাইকেলটাকে আঁকড়ে ধরে, আর হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে যায়; সে মানুষটা এখনও যায় নি, যদিও সূর্য ওঠবার পর তিনটি ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে।

মাটিসাহেবের কাজের জীবনের সেই তাড়াহুড়োর নিয়মটা যেন একটু বিপদে পড়েছে। শেষ রাতে উঠে উনুন জ্বেলে রুটি তরকারি তৈরি করে দিতে নিরুপমার যেটুকু সময় লাগে, সেটুকু সময়ের অপেক্ষা সহ্য করবার মত ধৈর্যও বিজনবিহারীর ছিল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজের ধড়াচূড়া গায়ে চড়িয়ে—শোলার হ্যাট, খাকি কামিজ, খাকি হাফ-প্যাণ্ট আর বুট পরে, বন্দুকটাও পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিল্ডে যাবার জন্য তৈরি হয়ে যেত বিজনবিহারী। মাটি-কাটার জায়গাটা, দশ মাইল বা বিশ মাইল দূরের ফিল্ডটা বিজনবিহারীর কাছে সত্যিই যেন যুদ্ধের ফিল্ড; তা না হলে সাজটাও এরকম জঙ্গী হয়ে যাবে কেন? দুপুরের খাওয়ার রসদ হিসাবে এক দিস্তা রুটি, দু' মুঠো আলুর তরকারি আর গুড়ের একটা ডেলা শালপাতায় মুড়ে নিয়ে এত ব্যস্তভাবে ছুটে যাবার অভ্যাসই বা হবে কেন? ঝড়-বাদলের দিনেও বিজনবিহারীর অভ্যাসের এই রীতিটার নড়-চড় হতে দেখা যায় নি। কিন্তু আজকাল, বিশেষ করে আজ, এ কি কাণ্ড করে বসে আছে বিজনবিহারী? সকালের রোদ ঝলমল করছে; তবু

বিজনবিহারী এখনও কাজে বের হয়ে যেতে পারে নি। মুখ টিপে না হেসে থাকতে পারবেই বা কেন নিরুপমা?

মেয়েকে বুকের উপর বসিয়ে শিউলিতলার ঘাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আছে বিজনবিহারী। সাইকেলটাও এক পাশে ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে। শোলার হ্যাটটা আর বন্দুকটাও। বিজনবিহারীর খাকি কামিজের বুকের উপর এক গাদা টাটকা শিউলি। মেয়েটা সেই শিউলির গাদা দু'হাতে ঘেঁটে ঘেঁটে খেলা করছে। আর দু'চোখ বন্ধ করে যেন একটা তৃপ্তির ভারে অলস হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে বিজনবিহারী।

—শুনছ? আবার ডাক দেয় নিরুপমা।

—কি হল? চমকে উঠে প্রশ্ন করে বিজনবিহারী।

—ফিল্ডে যাবে না? আবার মুখ টিপে হাসে নিরুপমা।

—তুমি মেয়েটাকে ধরবে, তবে তো যাব।

—মেয়ে তো ঘুমিয়েছিল। তুমি ওকে তুলে নিয়ে এলে কেন?

—এ সব কথার কোন মানে হয় না, নিরু। আমার কাজে বের হবার সময় খিটিমিটি করে দেরি করিয়ে দিয়ো না।

বিজনবিহারীর মেয়ে, বয়স দু' বছর, নাম সুনন্দা। নিরুপমা আর বিজনবিহারী ডাকে নন্দু। বিন্ধ্যাচলী বলে—নন্দুয়া। মাটি-সাহেবের বেটি নন্দুয়ার মুখটা কী সুন্দর! যৈসন ফুটলকা কমল বা!

রামসিংহাসনের বড় মেয়েটা, রাজমোহিনী, ছ' বছর বয়স, দৌড়ে এসে নন্দুকে কোলে তুলে নেয়। নিরুপমা জানে, এখন অন্তত একটি ঘণ্টা নন্দুকে কোলে নিয়ে আর কাঁকাল বেঁকিয়ে ট্যাং-ট্যাং করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবে রামসিংহাসনের এই মেয়েটা, ছ' বছর বয়সের এই রাজমোহিনী।

সাইকেল চালিয়ে বেশি দূর যায় নি বিজনবিহারী। কিন্তু যেন একটা বাধা পেয়ে আচমকা ব্রেক কষে থেমে পড়েছে বিজনবিহারী। অথচ পথের উপর কোন বড় পাথর-টাথরও নেই, কোন নালা খানা গর্ত-টর্তও নেই।

আকাশের দিকে অমন করে তাকিয়ে আর একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে বিজনবিহারী? আশ্বিনের সকালের আকাশ, ঝলমলে রোদ; কালো মেঘের ছিটে-ফোঁটাও তো কোথাও নেই।

সাইকেলটাকে হাতে ঠেলে আস্তে আস্তে হেঁটে ফিরে আসে বিজনবিহারী।

—কি হল? বিজনবিহারীর গম্ভীর মুখটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে নিরুপমার গলার স্বর যেন একটা চাপা ভয়ের গুঞ্জনের মত বেজে ওঠে।

হ্যাট আর বন্দুক নামিয়ে রেখে, পা থেকে বুট-জোড়াও খুলে সরিয়ে দিয়ে, যেন আরও হাল্কা হবার জন্য জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে বিজনবিহারী।

মুখটা গম্ভীর; কিন্তু চোখ দুটো চিক-চিক করছে। মাঝে মাঝে মাথা হেঁট করেও কি যেন ভাবছে। বিজনবিহারীরও যে এরকম একটা করুণ রকমের অশান্ত চেহারা থাকতে পারে, চোখে না দেখলে ধারণা করতে পারত না নিরুপমা। তা ছাড়া, কোনদিনও বিজন-বিহারীর চোখ দুটোকে এভাবে চিকচিক করে কাঁপতে দেখে নি নিরুপমা। যেন একটা ভক্ত মানুষের চোখ, কাউকে পূজো করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে।

—ফিরে এলে কেন? নিরুপমার গলার স্বর আবার ভীরু হয়ে কেঁপে ওঠে।

—ছিঃ, আজকেও সাত-সকালে জানোয়ারের মত রুটি চিবোতে হল। জঙ্গলে এসে অভ্যেসটাই জংলী হয়ে গিয়েছে।

কা'কে ধিক্কার দিয়ে আক্ষেপ করছে বিজনবিহারী? নিজেকে? কেন?

—এতদিন ধরে রাগের মাথায় কি-ভয়ানক একটা বিশ্রী ভুল করে এসেছি, নিরু! রাগই হল ভূত, একবার ঘাড়ে ভর করলে সব ভুল করিয়ে দেয়।

—ভুল? আশ্চর্য হয়ে তাকায় নিরুপমা।

—হ্যাঁ। আজ হল ছাব্বিশে আশ্বিন। বাবার মৃত্যু দিন। আজ আমার উপোস করা উচিত ছিল, বাবার বাৎসরিক কাজটাও করা উচিত ছিল।

নিরুপমার চোখ ফেটে বোধ হয় একটা করুণ বিস্ময়ের ফোয়ারা উথলে উঠবে, বুকটাও ফুঁপিয়ে উঠবে ; সরে গিয়ে বিজনবিহারীর পিছনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে নিরুপমা।

—যাই হক, তবু আজ আর আমি কিছু খাব না নিরু। হ্যাঁ, এখনই তাহলে বেরিয়ে যাই ; ছোট নদীটায় স্নান করে আসি। এক মুঠো তিল দাও তো, নিরু।

শিউলিবাড়ির ছোট নদী, ওই ডাঙ্গার উপর দিয়ে আধ মাইল এগিয়ে গেলে বালু ছড়ানো নদীটার বুকের মাঝখানের ঝিরিঝিরি বয়ে যাওয়া স্রোতটা দেখা যায়। নদীর ধারে একটা বট আছে, বটের পায়ের কাছে সিঁদুরমাখা একটা পাথর আছে ; আর সাতটা পাথরের ধাপ নিয়ে একটা ঘাটও আছে।

স্নান সেরে, এক মুঠো তিল স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিয়ে, আর ভিজে ধুতির খুঁটে গা জড়িয়ে যখন বাড়ি ফিরে আসে বিজনবিহারী, তখন বিজনবিহারীর তৃপ্তিভরা স্নিগ্ধ মুখটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই সরে যায় নিরুপমা। ভিতরের ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে কান্না চাপে আর চোখ মোছে।

বিজনবিহারী ডাক দিয়ে বলে, কোথায় গেলে ? শুনছ ? এ বছর ভুল-টুল যা হল তা তো হল ; কিন্তু আসছে বছর কাজটা এভাবে সারলে চলবে না। শাস্তরে যা বলে, যেটা নিয়ম, সেভাবে করতে হবে।

নিরুপমা সাড়া দেয় ঃ হ্যাঁ, করবে বইকি।

—কিন্তু সেজন্যে যে পুরুত চাই।

—চাই বইকি।

—ঝুমরা রাজের পুরুত শর্মাজীকে দিয়ে কাজ চলতে পারে, কিন্তু…কিন্তু বাঙালী পুরুত হলেই ভাল হয়। কি বল ?

নিরুপমা বলে, হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তো করছ, কিন্তু কোথায় তুমি ?

এবার আর নিরুপমার সাড়া পায় না বিজনবিহারী। কিন্তু চমকে উঠতে হয়। যেন ওঘরের ভিতর থেকে একটা ডুকরে ওঠা নিশ্বাসের শব্দ সাড়া দিয়েছে।

—এ কি হচ্ছে নিরু ? দেখে আশ্চর্য হয় বিজনবিহারী, আঁচল দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে মেঝের উপর নিথর হয়ে বসে আছে নিরুপমা। কেন ? আজ আবার কোন্ ভয়ের ছাপ দেখতে পেল নিরুপমার উজ্জ্বল হাসির চোখ দুটো ?

বিজনবিহারী ডাকে : কি হল ?

—কিছু না ; তুমি কিছু ভেব না।

—ভাবিয়ে দিয়ে ভেব-না বললে চলে না। আজ তুমি হঠাৎ কি ভেবে···।

—জানতে চেয়ো না। বলতে পারব না।

হঠাৎ চোখ ঘষে আর মুখের ওপর থেকে আঁচল সরিয়ে দিয়ে শান্ত ও সুস্থির হয়ে বসে জানলাটার দিকে তাকিয়ে থাকে নিরুপমা। চোখ দুটোও শান্ত শুকনো খট্‌খটে। নিরুপমার এরকমের মূর্তি একটু অদ্ভুত বটে ; তাই বোধ হয় একটা শালিক বার বার জানলার কাছে এসে বসছে, আর ঘরের ভিতরের দিকে একবার তাকিয়েই উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

বিজনবিহারীর কানেও বোধ হয় নিরুপমার কথার শব্দটা নতুন বিস্ময়ের আঘাতের মত বেজেছে। জানতে চেয়ো না! কী অদ্ভুত শুকনো স্বরে কথাটা বলেছে নিরুপমা। কথাগুলি যেন এক মুঠো ঠাণ্ডা আর বাসি ছাই, হঠাৎ জ্বালার ছোঁয়া পেয়ে তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিজনবিহারীর জীবনের কোন আগ্রহের জিজ্ঞাসাকে এভাবে চুপ করিয়ে দিতে চাইবে নিরুপমা, এটা যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না বিজনবিহারী।

কি-এমন নতুন আর অদ্ভুত কিছু দেখতে পেল নিরুপমা, যেজন্যে

নিরুপমার ভিজে চোখ দুটো এত শুকনো হয়ে যেতে পারে, আর গলার স্বরে এত শুকনো ছাই ঝরাতে পারে নিরুপমা? আজ ছাব্বিশে আশ্বিন, বাবার বাৎসরিক স্মৃতির তর্পণের জন্য স্রোতের জলে শুধু এক মুঠো তিল ভাসিয়েছে বিজনবিহারী, কিন্তু সেজন্য নিরুপমার প্রাণটা ভীরু হয়ে গিয়ে কেঁদে ফেলবে কেন? আবার কান্নার চোখ দুটোকে এত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ফেলবেই বা কেন? দেখতে পেয়েছে বিজনবিহারী, নিরুপমার হাতটা যেন হঠাৎ কঠোর হয়ে চোখ দুটোকে একটা হতাশ অভিমানের আঘাত দিয়ে জোরে জোরে ঘষছে।

বিজনবিহারী বলে, জানতে চাইব না কেন?

—না, জেনে তোমার কোন লাভ হবে না।

—আমাকে না জানিয়ে কি তোমার কোন লাভ হবে?

—তুমি সুখী হবে।

—তার মানে?

—তুমি শাস্তর আনবে, নিয়ম আনবে, বাঙালী পুরুত ঠাকুর আনবে; তবে আর আমাকে কেন?

—তার মানে?

—আমাকে বাদ দাও।

—এর মানেই বা কি?

—আমাকে চলে যেতে দাও।

—কোথায় যাবে?

—শিউলিবাড়িতে কি শ্মশান নেই?

—আছে বইকি। কিন্তু যাবে কেন?

—যেখানে শাস্তর আসবে, নিয়ম আসবে, মন্তর আসবে, সেখানে আমি থাকব কি করে? বাঁচব কি করে? নিরুপমার শুকনো চোখের তারা দুটো যেন ছটফটিয়ে পুড়তে থাকে।

—কি বললে? চেঁচিয়ে ওঠে বিজনবিহারী।

—বলছি তো! শাস্তর, নিয়ম আর মন্তর এসে তো একদিন

আমাকে তাড়িয়েই ছাড়বে; তার চেয়ে ভাল, তার আগে তুমিই তাড়িয়ে দাও। তোমার হাতের আগুন মুখে নিয়ে ছাই হয়ে যাই। শাস্তর এসে পড়লে তো আর তোমার হাতে এ সাহসটুকু থাকবে না।

নিরুপমার প্রাণও এমন বিদ্রোহ করতে জানে? আর বিদ্রোহটাও এমন ভাষায় কথা বলতে পারে? আর, ভাষাটাও বিজনবিহারীকে এত ভীরু বলে গাল দিতে পারে?

কি-যেন বলতে চায় বিজনবিহারী। কিন্তু নিরুপমার মাথাটা বিজনবিহারীর পায়ের কাছে আছড়ে পড়েছে। আর, যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছে সেই বিদ্রোহেরই একটা ভীরু অন্তরাত্মা।—শেষে তুমিও ভয় পেলে। আমি তবে আর কোন সাহসে ··।

বর্ষার জলঙ্গী সাঁতার দিয়ে পার হতে ভয় পায় নি যে ষোল বছর বয়সের বিজু, চম্বলের বালিয়াড়ীতে আগুন-চোখো লেপার্ডের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলতে হাত কাঁপে নি যে কুড়ি বছর বয়সের বিজনবিহারীর, আজ আটত্রিশ বছর বয়সের সে বিজনবিহারী ভয় পেয়েছে? নিরুপমাকে বুক থেকে নামিয়ে দিয়ে শাস্তর বুকে তুলে নিতে চাইছে?

শাস্তর আসছে; যেন হুটোপুটি করে জংলী হাতী আসছে, নিরুপমার জীবনের সুখ আশা আর তৃপ্তির ছোট্ট তাঁবুটাকে উপড়ে ফেলে দেবার জন্য। এই ভেবে ভয় পেয়েছে নিরুপমা। কিন্তু ভুল করছে নিরুপমার দুর্বল বিশ্বাসের বুকটা। বোধ হয় ভুলেই গিয়েছে নিরুপমা, এই বিজনবিহারী জংলী হাতীর চোখের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিতে জানে, পারে, তার বুক একটুও কাঁপে না।

মেঝের উপর থেকে নিরুপমার লুটিয়ে পড়া শরীরটাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে আর দাঁড় করিয়ে বুকের কাছে শক্ত করে ধরে রাখে বিজনবিহারী।—তুমি আগে, না শাস্তর আগে?

নিরুপমা আবার ফুঁপিয়ে ওঠে।—বুঝতে পারছি না।

—তোমাকে আগে নিয়ে এসেছি, না শাস্তর আগে নিয়ে আসতে চেয়েছি ?

—সবই তো জানি। কিন্তু···।

—কিন্তু আবার কিসের ?

—শুনে যে বড় ভয় করছে।

—কোন ভয় নেই। কোন ভয় আর থাকতেই পারে না।

চিরকাল যে ভাষায় নিরুপমাকে আশ্বাস দিয়ে এসেছে এই নির্ভয়ের মানুষটা, আজও সেই ভাষায় নিরুপমাকে আশ্বাস দিয়ে কথা বলছে। এই আশ্বাসের কাছে লুটিয়ে পড়ে শান্ত না হয়ে পারবে কেন নিরুপমা ?

ছু'চোখ বন্ধ করে, শান্ত আর স্নিগ্ধ একটা মুখ নিয়ে, আর মাথার ভারটাকে একেবারে অলস করে বিজনবিহারীর বুকের উপর রেখে দিয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়তে চায় নিরুপমা।

বিজনবিহারী বলে, আজ আর আমরা কাকে ভয় করব বল ? কার সাধ্যি আছে যে, আমার ঘরের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ করবে ? কার সাহস আছে যে ঠাট্টা করবে ? কার এমন মাথা খারাপ হবে যে, ঘেন্না করবে ? ফুলনবাবু সেদিন কি বলেছিলেন, জান ?

হেসে ওঠে বিজনবিহারী ; যেন উৎফুল্ল এক পৌরুষের শান্ত গর্বের কণ্ঠস্বর হেসে উঠেছে ঃ ফুলনবাবু বলছিলেন, মাটিসাহেবের বাড়িটা যেন হিমালয়জীকা সংসার।

—তার মানে ?

—তার মানে আমি হিমালয় ; তুমি মেনকা আর নন্দু হল উমা।

নিরুপমার চোখ ছুটো অদ্ভুত একটা অনুভবের আবেশে নিবিড় হয়ে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থম্‌থম্ করে ; যেন একটা স্বপ্নের কোলে বসে আছে নিরুপমার প্রাণটা ; ফুলনবাবুর কথা নয় ; যেন এক গাদা ফুলচন্দনের কথা ছু কান দিয়ে স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছে নিরুপমা।—হিমালয়জীকা সংসার।

—সব ভয় পার করে দিয়েছি, নিরু। তবু তুমি ভুল করে একটা পূর্বজন্মের যত বাজে ছায়া-টায়া দেখে…।

হেসে ফেলে নিরুপমা।—না, আর ভয় করি না।

—তুমি না সেদিন ঠাট্টা করে বলেছিলে…।

—কি ?

—শিউলিবাড়ির রাজার নাম মাটিসাহেব।

—বলেছিলাম, কিন্তু ঠাট্টা করি নি।

—তবে ?

বিজনবিহারীর শেষ কথাটা যেন এতক্ষণের একটা মিথ্যে আতঙ্কের লজ্জাকে প্রশ্ন করে হাসিয়ে দেয়। নিরুপমা বলে, বাঙালী পুরুত ঠাকুর কি শুধু বাবার বাৎসরিক কাজের জন্যই আসবেন ?

—না, তা কেন হবে ? এখানকার সব কাজই করবেন। পূজো-পার্বণ, সত্যনারায়ণের ব্রতট্রত, কিংবা তোমার কোন মানত-টানতের পূজো থাকলেও কাজ করবেন। মোট কথা…।

নিরুপমার দুই চোখ হেসে হেসে ঝিকঝিক করে।—কি ?

—মোট কথা, আর জংলী হয়ে থাকা চলবে না। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী।

শালিকটা আবার এসে জানলার কাছে বসেছে; ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়েছে। কিন্তু তখুনি আবার ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে গেল না শালিকটা। বোধ হয় আর ভয় পেয়ে নয়, বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতে চাইছে।

বিজনবিহারী বলে, তা ছাড়া, মিছিমিছি কারও ওপর আর রাগ পুষে রাখার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া…।

হঠাৎ নীরব হয়ে গিয়ে, আর জানলার বাইরে আশ্বিনের আকাশটারই দিকে পিপাসিতের মত তাকিয়ে থাকে বিজনবিহারী। তার পরেই, গলার স্বর একেবারে মৃদু করে দিয়ে বলতে থাকে : হবে, একে একে সবই হবে; সবই করে নিতে হবে; ছেড়ে দেবই বা কেন ?

ভাষাটা হেঁয়ালী, কিন্তু গলার স্বরটা যেন একটা নতুন মানতের প্রতিধ্বনি। কিংবা আশ্বিনের আকাশের বুকে একটা ক্ষমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে একটা খুশী অভিমান। নয় তো একটা পুরনো মায়ার হাতছানির দিকে তাকিয়ে কথা বলছে ব্যাকুল একটা পিপাসা। যেন দেউলবাড়িতে ভোগের ঘণ্টা বাজছে, খালের এ পারে দাঁড়িয়ে শুনতে পাচ্ছে আর ছটফট করছে ছোট্ট বিজুর দুরন্ত লোভ।

॥ বারো ॥

—মাটিসাহেবের মতলবটা এবার বুঝতে পারা গেল। মুখ টিপে হাসতে থাকে, নিরুপমা।

তিন বছর আগেও একবার ঠিক এইভাবে মুখ টিপে হেসে বুক-ভরা খুশীর ভার সামলাতে চেষ্টা করেছিল নিরুপমা। কিন্তু সামলাতে পারে নি। আজও নিরুপমার সারা মুখ রাঙা হয়ে ওঠে; শিউলি-বাড়ির ভাগ্যটা যে সত্যিই ভোরের আলোর মত রাঙা হয়ে হাসছে।

সাইকেলের চাকার ধুলো মুছতে ব্যস্ত বিজনবিহারী নিতান্ত অব্যস্ত স্বরে কথা বলতে গিয়েও নিরুপমার মুখের দিকে তাকায়।—মাটিসাহেবের মতলব?

—হ্যাঁ।

—কি মতলব?

—শিউলিবাড়িকে একেবারে কেষ্টনগর করে তুলতে চাইছেন মাটিসাহেব।

বিজনবিহারী হাসে: বাঃ, খুব চমৎকার সন্দেহ করতে শিখেছ, দেখছি।

মাটিসাহেবের কাঁচা ইটের সেই বাড়ির ঘরগুলি এখন ধান অড়হর আর মকাইয়ের ভাণ্ডার। সেই শিউলি যেখানে-যেখানে ছিল, সেখানে-সেখানে এখন নতুন শিউলির ভিড়। নতুন বাগানের মাদারের বেড়ার সঙ্গে কৃষ্ণকলির ঝাড় এলিয়ে এলিয়ে ছড়িয়ে আছে। বছরে দু'বার ফুল ফোটায় কৃষ্ণকলির ঝাড়—লাল হলদে বেগুনী আর হলদে-লাল। পুরনো বাড়ির সামনে দুটো পাকা ইটের ঘর, বারান্দাটা বেশ চওড়া। বারান্দায় চার-পাঁচটা চেয়ার আর একটা টেবিল।

দিল্লিতে করোনেশন দরবার। শিউলিবাড়ি স্টেশনের মাথার উপরে উঁচু বাঁশের ডগায় পুরো একটা মাস ধরে ইউনিয়ন জ্যাক

উড়ছে। সেই চৌধুরীবাবু বদলি হয়ে চলে গিয়েছেন। বদলি হয়ে এসেছেন গাঙ্গুলীবাবু আর বোসবাবু—এস-এম আর এ-এস-এম। দেখে আরও খুশী হয়েছে বিজনবিহারী, দুই ভদ্রলোকই সপরিবারে এসেছেন।

গাঙ্গুলীবাবুর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। কোলেরটার বয়স চার মাস। অথচ গরুর দুধ পাওয়া যাচ্ছে না। রামসিংহাসন শুধু মোষের দুধ বিক্রি করে। খুবই চিন্তায় পড়েছেন গাঙ্গুলীবাবু।

কিন্তু গাঙ্গুলীবাবুকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে বিজনবিহারী। বিজনবিহারী তার বাড়ির গরুর দুধের আধ সের মাত্র সুনন্দার জন্য রেখে দিয়ে বাকি সবটাই গাঙ্গুলীবাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।—আমি থাকতে শিউলিবাড়িতে এসে কোন বাঙালী কষ্ট পাবে, এটা তো ভাল দেখায় না, নিরু।

ছোট নদীর ধারে এক বিঘে জমি করেছিল বিজনবিহারী। সে জমি চক্রবর্তীকে দলিল করে দান করে দিতে হয়েছে। সে জমিতে পুরনো বটগাছের কাছে নতুন কালীবাড়ি হয়েছে। কালীবাড়ি তৈরির সব ইট বিজনবিহারীই দিয়েছে। তশীলদার ফুলনবাবুর কাছ থেকে কাঠ আদায় করা হয়েছে। কালীবাড়ীর পুরোহিত চক্রবর্তী মশাইও সপরিবারে—স্ত্রী আর দুটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন, কি করে দিন চলবে? যজমান কোথায়? আর পুজোর ভিড়ও কতটুকু।

কালীপূজা কমিটি তৈরি করে চক্রবর্তীকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে বিজনবিহারী। বছরে চার আনা চাঁদা আর একটা সিধা—ধান চাল চিঁড়ে কিংবা কলাই; এরই মধ্যে শিউলিবাড়ির ষাট-সত্তরজনকে কমিটির সদস্য করে ফেলেছে বিজনবিহারী। কিন্তু তবু চিন্তা করতে হচ্ছে, চক্রবর্তীর জন্য আর কী ব্যবস্থা করা যায়। তা না হলে সত্যিই যে ছেলেপুলে নিয়ে কষ্টে পড়বে চক্রবর্তী।

কবিরাজ সেনবাবুর জন্যে এতটা চিন্তা করতে হয় নি। তাঁর জন্য শুধু এক বিঘা বসত জমির ব্যবস্থা করে দিতে হয়েছে। ঝুমরা রাজ

আর তাঁর রাজপুত কুটুমদের বাড়ি থেকে সেনবাবুর ঘন ঘন ডাক আসে। তা ছাড়া শিউলিবাড়ির এতগুলি ঘর তো আছেই। এরই মধ্যে মন্দ রোজগার করছেন না সেনবাবু। সেনবাবুর স্ত্রী একদিন এসে নিরুপমাকে নতুন সোনার বালা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সেন-বাবুর মেয়ে দুটি বড় শান্ত। সুনন্দার সঙ্গে খেলা করতে এসে এ-বাড়িতেই ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

দেখতে পায় বিজনবিহারী, লুকোচুরি খেলার জন্যে তৈরি হয়েছে সুনন্দা, রামসিংহাসনের তিন ছেলেমেয়ে, সেনবাবুর দুই মেয়ে আর নতুন বস্তির লালাদের যত ছেলেমেয়ে।

সাইকেল নিয়ে ঘরের বাইরে এসে একবার থমকে দাঁড়ায় বিজনবিহারী। গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে বাচ্চাদের দল, মাঝখানে সুনন্দা। বাচ্চাদের বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে আর ছড়া কেটে ছুট আর ফুট গুণছে সুনন্দা—আডাং বাডাং তিতা তোর, বীর বার শং!

সাইকেলটাকে ঝপাং করে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে বিজনবিহারী।—আর একটা ছড়া আছে নন্দু, খুব ভাল ছড়া।

—শিখিয়ে দাও।

—শেখ, সবাই শেখ।...উচ্ছে পটল চচ্চড়ি; তাতে দিলাম ফুল-বড়ি; ফুলবড়িটা গলে গেল; সবাই মিলে এক পা তোল।

বিজনবিহারী এক পা তুলে দাঁড়ায়, বাচ্চার দলও এক পা তুলে দাঁড়ায়। সব শেষে যার পা পড়ে, সে ছুট হয়ে সরে দাঁড়ায়।

বিজনবিহারী বলে, বল আবার বল; উচ্ছে পটল চচ্চড়ি।

হল্লা শুনে নিরুপমা বের হয়ে আসে: এটা আবার কী শুরু করলে?

সাইকেলটাকে তুলে নিয়ে বিজনবিহারী বলে, একটা বাংলা স্কুল চালু না করে উপায় নেই নিরু; তোমার নন্দুর ভাষা আডাং বাডাং করতে শুরু করে দিয়েছে।

হ্যাঁ, বাংলা স্কুলটা চালু করতে একটা বছরের বেশি সময়

লাগে নি। একটা প্রাইমারী স্কুল। স্কুল কমিটির প্রথম প্রেসিডেণ্ট বিজনবিহারী। সেনবাবুর দুই মেয়ে, চক্রবর্তী মশাইয়ের তিন ছেলে আর স্টেশনের দুই বাঙালী পরিবারে চারিটি ছেলে-মেয়ে; তা ছাড়া বাঙালী নয় যারা, তাদেরও বাড়ির পঁচিশটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে শিউলিবাড়ির প্রথম স্কুলের প্রতিষ্ঠার উৎসব যেদিন হয়ে গেল, সেদিন আবার রাতের আকাশটার দিকে তাকিয়ে চিকচিক করেছিল বিজনবিহারীর চোখ।

নিরুপমা বলে, স্কুলের কি নাম হল ?

—রমাসুন্দরী বেঙ্গলী প্রাইমারী স্কুল।

চমকে ওঠে নিরুপমা। এখন আর বুঝতে অসুবিধে নেই, কেন চিকচিক করছে বিজনবিহারীর চোখ দুটো।

জোরে একটা নিশ্বাস ছেড়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী।—কেন যেন মেজদির নামটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তাই স্কুলটাকে ওই নামটা দিয়ে দিলাম। মেজদির বাড়ির দানাদার সন্দেশের স্বাদ আজও তো ভুলতে পারি নি, নিরু।

নিরুপমার চোখ দুটো যেন আবার ছলছল না করে ওঠে, তাই বোধ হয় আরও জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতে থাকে বিজনবিহারী।—চক্রবর্তী মশাইয়েরও একটা সুবিধে হয়ে গেল। বাঙালী বাচ্চাদের বাংলা পড়াবেন, হিন্দী বাচ্চাদের অঙ্ক। বুড়ো লালাবাবু হিন্দী পড়াবেন। দুই মাস্টারের মাইনের জন্য স্কুল কমিটি দেবে দশ টাকা, আর জেলা বোর্ড দেবে দশ টাকা।

কবিরাজ সেনবাবুকে আর কালীবাড়ির পুরোহিত চক্রবর্তীকে শিউলিবাড়িতে আনতে গিয়ে পুরো একটা বছর কী চেষ্টা আর কত চিন্তাই না করতে হয়েছে। বিজনবিহারীর কাছ থেকে নানা অনুরোধের আর অঙ্গীকারের চিঠি নিয়ে রামসিংহাসন বার বার ছুটেছে, বর্ধমানে আর রাণীগঞ্জে। মাটিসাহেব নামে শিউলিবাড়ির সব চেয়ে সম্মানের আর দাপটের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে অনেক ভরসার পাকা কথা পেয়ে আর রেল-খরচ পেয়ে তবে তাঁরা এসেছেন। নিরুপমার কাছে

আগেই বলে রেখেছিল বিজনবিহারী : আমি ওদের আনিয়ে ছাড়ব, নিরু।

নিরুপমাও দেখে আশ্চর্য হয়েছে, বয়সটা চল্লিশ বছর পার হয়ে গেলেও মাটিসাহেবের সেই জেদের মাটি একটুও নরম হয়ে যায় নি।

কার্তিক মাসের হিমেল কুয়াশায় ভরা শিউলিবাড়ির অমাবস্যায় শীতাতুর মাঝরাত যখন একেবারে নিস্তব্ধ, কালীবাড়িতে শ্যামাপূজার ঘণ্টাধ্বনি যখন বাজতে শুরু করে, সিধো চামার যখন ঢাক বাজায়, তখন কমিটির প্রেসিডেন্ট এই মাটিসাহেব যেন রাতজাগা দুরন্ত ছেলের উৎসাহ নিয়ে আর চঞ্চল হয়ে কালীবাড়ির আঙিনায় ছুটোছুটি করে। লোক পাঠিয়ে ফুলনবাবুকে খবর দেয়, নতুন বস্তির লালাদেরও ডেকে পাঠায়, শিগগির চলে এস সবাই, ভোগ হয়ে যেতে আর দেরি নেই ; সবাইকে প্রসাদ নিয়ে যেতে হবে।

রেলওয়ের এক বাঙালী অফিসার এসেছিলেন ; স্টেশনের রেস্টরুমে একটা দিন ছিলেন। পদস্থ অফিসার, তাঁর খাওয়া-দাওয়ার অভিরুচিও বেশ পদস্থ। গাঙ্গুলীবাবু একটু চিন্তায় পড়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গাঙ্গুলীবাবুকে একটুও ব্যস্ত হতে হয় নি। শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবই অফিসারকে খাওয়াবার সব দায় খুশী হয়ে নিজের উপর টেনে নিয়েছেন। নিজের হাতে পোলাও আর মাংস রান্না করেছে বিজনবিহারী ; নিরুপমা রেঁধেছে বড়ি দিয়ে আড় মাছের ঝোল, কাঁচা পেঁপের সুক্ত, লাউয়ের ঘণ্ট আর পায়েস। অফিসার ভদ্রলোক বিজনবিহারীকে বলেছেন, আপনি মশাই এখানে না থাকলে ছাতুটাতু খেয়ে আমার বোধ হয় একদিনেই পাঁচ পাউণ্ড ওজন হারাতে হত।

অফিসারকে নিজের বাগানের এক ঝুড়ি পেঁপে উপহার দিয়ে বিজনবিহারী ছুটো কাজের কথাও বলে নিয়েছে ; স্টেশনের নামটা শুধু ইংরেজী হরফে লেখা আছে স্যার, আপনি কাইগুলি একটা ব্যবস্থা করুন, যাতে বাংলা হরফেও নামটা লেখা হয়।

—তা হয়ে যাবে ; একটা অর্ডার করিয়ে দিতে পারব।

—তা ছাড়া, এই ম্যাপটা একবার দেখুন স্যার, কত সস্তায় কত ভাল ভাল প্লট বিক্রী হচ্ছে। শিউলিবাড়ির চমৎকার জল-হাওয়ার কথাটা আপনারও জানা আছে নিশ্চয়। সুতরাং যদি একটু প্রচার করে দেন যে···।

—কিসের প্রচার ?

—আমার ইচ্ছে, বাঙালীরা এখানে এসে যেন জমি কেনেন আর বাড়ি করেন।

—ভাল কথা বলেছেন। আমার মনে হয়···হ্যাঁ···রামরাজাতলার যশোদাবাবুকে জানালে কাজ হতে পারে, ভদ্রলোক রটনা করতে খুব পোক্ত।···দিন আপনার ম্যাপটা।

মাটিসাহেবের মাটি-কাটা ঠিকেদারীর কাজও বেড়েছে; কারণ সিলুয়াডিতে আরও দুটো নতুন কোলিয়ারী চালু হয়েছে। নতুন নতুন আরও রাস্তা খুলতে হবে। সিলুয়াডি রোডের আট মাইলের পোস্ট থেকে এদিকে উনিশ মাইলের পোস্ট পর্যন্ত নতুন কাঁকর আর মাটি ফেলতে হবে। রাস্তাটা চওড়া না করলে কয়লা-বোঝাই মোটর ট্রাক চলতে পারবে না।

দুধিয়া সিমেণ্ট কারখানার জন্যও জঙ্গলের ভিতরে তিনটে ছোট-বড় সড়ক খুলতে হচ্ছে। মাটি কাটাবার ঠিকে পেয়েছেন মাটিসাহেব। একটা সড়ক চালু হয়ে গিয়েছে। দিন-রাত চুণাপাথরে বোঝাই হয়ে মোটর ট্রাক নতুন সড়কে ছুটতে শুরু করেছে।

মাটিকাটার কাজটাকে হাসিতে খুশীতে, গানেতে আর ছড়াতে ভরে দিয়েছেন মাটিসাহেব। আগে শুধু নিজেই মুণ্ডারি ভাষায় গান গেয়ে মাটি-কাটা কুলির দলের ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়িকে হাসাতেন। আজকাল একটা নতুন কাণ্ড করছেন। বাংলা গান গেয়ে মুণ্ডা আর ওরাওঁ কুলির দলকে খুশী করছেন। হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল —মাটিসাহেবের গানটা শুনে শুনে কুলির দলও গানটাকে যেন গলায় গেঁথে নিয়েছে। এক একদিন, শালবনের মাথায় যখন বিকেলের রোদ একটু ম্লান হয়ে আসে, তখন মাটিসাহেবের গান শুনতে পেয়ে যত

হোরো টিগ্‌গা আর কুজ্‌জুর হাতের কোদাল নামিয়ে রেখে ব্যস্ত-ভাবে ছুটে আসে। মাটিসাহেবের সেই 'হরি দিন তো গেল'র সঙ্গে গলা মিলিয়ে একজন হোরো আর দু'জন টিগ্‌গা গান গায়, আর একজন কুজ্‌জুর হয়তো মাদল বাজাতে শুরু করে।

মাটিসাহেবের বাগানটা যেন চাঁপাকলার জঙ্গল। চুঁচড়োর সরকারী কৃষির অফিসে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিয়ে পাঁচশো চাঁপা কলার চারা আনিয়েছিলেন মাটিসাহেব। কিছু বিলিয়েছেন মুণ্ডাদের গাঁয়ে গাঁয়ে, কিছু শিউলিবাড়িতে আর বাকিটা নিজের বাগানে পুঁতেছেন। মাটিসাহেবের বাগানের প্রথম পাকা কলার কাঁদি কালীবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাটিসাহেব, তার পরের মাসেই প্রায় পঞ্চাশ কাঁদি কলা বেচে আর দশ কাঁদি কলা শিউলিবাড়ির ঘরে ঘরে বিলিয়ে, চেঁচিয়ে উঠেছিলেন মাটিসাহেব—আসছে বছরেই দেখতে পাবে নিরু, রাঁচির পাইকারেরা আর শেওড়াফুলি যাবে না ; ওরা এই শিউলিবাড়ির বাজারে চাঁপাকলা কিনতে ছুটে আসবে।

নিরুপমা হাসে : তোমার কই মাছের অবস্থা কি দাঁড়াল ?

—খুব ভাল অবস্থা। শিগগির দেখতে পাবে, শিউলিবাড়ির বাজারে কইমাছ উঠেছে। বছর দুই আগে লালগোলা থেকে একদল জেলে আর দশ হাজার কই মাছের চারা আনিয়ে ঝুমরা রাজের চারটে ঝিলের জলে ছেড়েছিল বিজনবিহারী। কিছু কালবোশের চারাও ছাড়া হয়েছিল। দেখে এসেছে বিজনবিহারী, সে কই এখন বেশ বড় হয়েছে, শালুকের ডাঁটা ছিঁড়ে তছনচ কাণ্ড করছে কইয়ের ঝাঁক।

প্রায় তিনটে মাস ধরে সন্ধ্যা থেকে শুরু করে সারারাত পর্যন্ত হাত চালিয়ে একটা জাল বুনেছে বিজনবিহারী, কইধরা জাল। সকাল বেলায় জালটাকে হরতকীর কষে চুবিয়ে চুবিয়ে আর ব্যস্তস্বরে ডাক দেয় বিজনবিহারী—নিরু তুমি কোথায় ?

—এই তো।

—তুমিও তো এসব কাজ কিছু-কিছু করতে পার, নিরু।

—আমি ?

—হ্যাঁ।

—আমি কইমাছ ধরব ?

—আরে না ; এসব কাজ মানে একটু-আধটু শখের কাজ ; তার মানে শিউলিবাড়ির মেয়েগুলোকে অন্তত আলপনা আঁকবার কায়দাটা শিখিয়ে দিতে পার তো।

নিরুপমার ঠাট্টার চোখ ছুটো করুণ হয়ে যায়। মানুষটা যে-কাজের কথা বলছে, সে কাজ যে মানুষটার আত্মার একটা ব্রত হয়ে উঠেছে। এই মাটি-কাটা খাটুনির মধ্যেও সর্বক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখছে, একটা হারানো জগতের যত ফুল ফল কইমাছকে ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছে আর খাটছে। এই তো, সেদিন বিন্ধ্যাচলী এসে বলে গেল বলেই জানতে পেরেছে নিরুপমা, বাঙালীবাবু আজকাল রোজ একবার গিয়ে রাজমোহিনীর বাপকে ক্ষীরমোহন আর সরপুরিয়া তৈরি করা শেখাচ্ছে! হাঁ দিদি ; বাঙালী মিঠাইভি তোহর ঐসন মিঠি বা !

বলতে ইচ্ছে করেছিল, কিন্তু বলতে পারে নি নিরুপমা, আমি একটুও মিষ্টি নই বিন্ধ্যাচলী, মিষ্টি তোমাদের ওই বাঙালীবাবু, ওর স্বপ্নটাও মিষ্টি। শিউলিবাড়ির পাথুরে মাটিকে মিষ্টি করে দেবার জন্য ও শুধু একাই খাটছে ; আমি একটা অপদার্থ ; আমার কোন গুণ নেই যে ওকে সাহায্য করতে পারি।

বিজনবিহারীর হাতের জালটার দিকে তাকিয়ে নিরুপমা বলে, তুমি এখন ওটা রেখে দাও লক্ষ্মী ; একটু জিরোও ;

—জিরোলে চলবে কেন ?

—আমাকে বলে দাও কি করতে হবে, সব করে দিচ্ছি।

—কিন্তু আমি যে কথাটা বললাম…।

—শুনেছি। রাজমোহিনীর বিয়েতে আমি নিজেই গিয়ে আলপনা এঁকে দিয়ে আসব।

—অ্যাঁ ? রাজমোহিনীর বিয়ে ? কত বয়স হল রাজমোহিনীর ?

—তা মন্দ কি ? ষোল-সতের হবে। ওদের মতে একটু বেশি বয়স হয়ে গেছে।

—তাহলে আমাদের নন্দুর কত বয়স হল ?

—তের পার করেছে নন্দু।

—তা হলে তো নন্দুর বিয়ের কথাটা এখন থেকেই ভাবতে হয়।

—ভাবা তো উচিত। বলতে গিয়ে নিরুপমার চোখের পাতা যেন চমকে কেঁপে ওঠে, আর মুখটাও গম্ভীর হয়ে যায়।

—নিশ্চয় উচিত। বলতে বলতে হাত ধুয়ে নিয়ে আর হেসে হেসে বাগান দেখতে চলে যায় বিজনবিহারী।

বোধ হয় বলতে চেয়েছে বিজনবিহারী, ভাবা উচিত নিশ্চয়; কিন্তু ভাবনা করা নিশ্চয় উচিত নয়। সুনন্দার বিয়ে দিতে হবে; কল্পনাটা যেন নিজেরই খুশীতে হেসে উঠেছে। বিজনবিহারীর চোখের দৃষ্টি আর গলার স্বরে অদ্ভুত এক স্নেহাক্ত আনন্দ উথলে উঠেছে। তাই স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে বাগানের কাজে ব্যস্ত হবার জন্য চলে গেল বিজনবিহারী।

না, নিরুপমাও আর ভাবনা করে মনের ভার বাড়াতে চায় না। ভাবনা করবার কোন দরকার হয় না। ওই মানুষটা যে, ভাবনা জয় করবার যোদ্ধা, আর ভরসা তৈরি করবার কারিগর। অনেকবার এমন হয়েছে; সুনন্দার মুখটাকে নিজের হাতে সাবান দিয়ে ধুয়ে, চোখে কাজল বুলিয়ে, কপালের উপর ছোট্ট একটা কুমকুমের তারা এঁকে দিতে গিয়ে হঠাৎ নিরুপমার চোখের হাসি গম্ভীর হয়ে গেছে; যেন আচমকা একটা কালো-ছায়াকে দেখতে পেয়েছে নিরুপমা। কিন্তু···না, ভুল দেখেছে নিরুপমা। বিজনবিহারীর মুখের অবাধ হাসিটা যেন ফটিকজলের হাসি, নিরুপমার চোখের সব গম্ভীরতা ধুয়ে দিয়ে চলে যায়। না, ওই কালোছায়াটা কালো বটে, ছায়াও বটে। কিন্তু অন্ধকারের কালো নয়; ওটা শিবপুকুরের ডাঙ্গার বুকের সেই তালবনের ছায়ার মত একটা কাজলমায়ার কালো; চড়কের মেলা দেখতে যারা দূর গাঁয়ে যায়, তাদের মাঝপথের আর মাঝবেলার শান্তি হল ওই তালবনের কালোছায়া।

রাজমোহিনীর বিয়েতে আলপনা এঁকেছে নিরুপমা। কিন্তু এই একটি আলপনা দেখে শিউলিবাড়ির যেন চোখ ভরে নি। লালাদের বাড়ির বউ আর মেয়েরা বার বার এসেছে; নিরুপমার কাছে আলপনা আঁকা শিখেছে।

—ওরা মোচা রাঁধতে জানে না নিরু; মোচাগুলোকে জঞ্জাল মনে করে ফেলে দেয়। তুমি যদি ওদের একটু শিখিয়ে দাও, তবে ভাল হয়। বিজনবিহারীর ইচ্ছের কথাটা যেদিন শুনতে পেল নিরুপমা, তারপর বোধ হয় তিনটে মাসও পার হয় নি, ভাত খেতে বসে এক বাটি মোচার ঘণ্টের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী —ঘণ্টর চেহারা খুব খুলেছে দেখছি।

নিরুপমা হাসে: মুখে দিয়ে নিয়ে বল, কেমন হয়েছে?

মোচার ঘণ্ট মুখে দিয়ে বিজনবিহারী আরও খুশী হয়।—চমৎকার।

—কিন্তু আমি রাঁধি নি।

—অ্যাঁ? কে রেঁধেছে?

—ফুলনবাবুর ছেলের বউ পার্বতী রেঁধে পাঠিয়েছে।

—কি আশ্চর্য! কিন্তু···মনে হচ্ছে, কেউ যেন পার্বতীকে শিখিয়ে দিয়েছে।

—তা তো বটেই।

—কে শেখাল?

—তুমি যাকে বলেছিলে, সেই শিখিয়েছে।

নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটা পরম কৃতার্থতার আনন্দে চোখ বড় করে হাসতে থাকে বিজনবিহারী: তাই বল।

—শত্রুঘন্ বাবুর মেয়েও এসেছিল।

—কেন ?

—বাঙালী রান্না শিখতে চায়।

—শিখিয়েছ ?

—হ্যাঁ।

—কি শেখালে ?

—ফোড়ন দিয়ে চালতের অম্বল।

—খুব ভাল করেছ। ফোড়নের রান্না ওরা একেবারেই জানে না ; তা ছাড়া চালতে যে খাওয়া যায়, তাও জানত না।

—নন্দুও একটা কাণ্ড করেছে।

—কি করল নন্দু ?

—লালাদের বাড়ির বুড়িদের অবশ্য রাজি করাতে পারে নি নন্দু, কিন্তু বউগুলোকে আর মেয়েগুলোকে বাঙালী ধরনে শাড়িপরা ধরিয়েছে।

—বল কি ? চেঁচিয়ে ওঠে বিজনবিহারী।

—এমন কি বিন্ধ্যাচলীকেও একদিন···। হেসে ফেলে নিরুপমা।

ও কি ? বিন্ধ্যাচলীই যে কথা বলছে। যেন একটা হাসির ঝংকার লুটোপুটি খেতে খেতে এগিয়ে আসছে—অব তো আমি নন্দুয়ার শাশুড়ীকে সাথ বাংলা বলতে পারবে।

একেবারে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় বিন্ধ্যাচলী। দু' ফেরতা দিয়ে শাড়ি পরা আর আঁচল দোলানো একটা মূর্তি। বিজনবিহারীকে দেখতে পেয়েই জিভ কেটে লজ্জিত আতঙ্কের মত ছুটে পালিয়ে যায়।

কাঁথা সেলাই করছিল নিরুপমা। পালতোলা নৌকো নদীর জলে ভাসছে—নক্সাটার নদীর জলের ঢেউগুলো নীল স্তুতোর, নৌকোটা লাল স্তুতোর। বাকি সবটা সাদা সুতো দিয়ে পিঁপড়ে-সারি ফোঁড়ের শেলাই। মাটিসাহেবের বাড়ির কাঁথা দেখে হরি রাজপুতের মা আশ্চর্য হয়– আহা! কি সুন্দর জিনিস! কেমন করে বানালে, এ নন্দুকে মাঈ ?

—শিখবেন ?

—শিখিয়ে দেবে তবে তো শিখব।

একটা বছর ধরে নিরুপমার ঘরে সারাটা দুপুর বসে বসে, একা হরি রাজপুতের মা নয়, ফুলনবাবুর ছেলের বউ আর লালাদের মেয়েরাও কাঁথা শেলাই করেছে। নিরুপমা, বলতে গেলে, একরকম হাতে ধরে সবাইকে কাঁথা শেলাইয়ের কাজ শিখিয়েছে।

আর একটা বছর পার হতেই শিউলিবাড়ির জীবনে আরও একটা উৎসবের মত কাণ্ড করে ফেলল যা, সে হল খেজুর রসের পায়েস। বিজনবিহারীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেয়ে স্কুল কমিটির সবাই যেদিন খেজুর রসের পায়েস খেল, বলতে গেলে সেদিন থেকেই উৎসবটা শুরু হয়েছিল। শীতের পুরো তিনটে মাস ধরে, যেমন রামসিংহাসনের বাড়িতে তেমনই ফুলনবাবুর আর লালাদের বাড়িতে খেজুর রসের পায়েস রাঁধবার ধুম পড়ে গেল। বুঝিয়ে দিয়েছিল বিজনবিহারী—আগে বেশ ঘন করে রস জ্বাল দিয়ে নেবেন, তারপর ভিন্ন করে দুধে চাল ছেড়ে দিয়ে জ্বাল দেবেন ; বেশ একটু ক্ষীর-ক্ষীর হলে তাতে রস ঢেলে দিয়ে, শেষে এলাচ গুঁড়ো ফেলে দিয়ে···।

রমাসুন্দরী বেঙ্গলী প্রাইমারী স্কুলের নামটারও উন্নতি হয়েছে। ওটা এখন রমাসুন্দরী বেঙ্গলী মাইনর স্কুল। মাইনর স্কুলে শুধু ছেলেরা পড়ে, কাজেই নতুন করে একটা প্রাইমারী স্কুল করতে হয়েছে—শিউলিবাড়ি প্রাইমারী স্কুল ; প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন ফুলনবাবু।

মাইনর স্কুলের ছাত্রের সংখ্যা দু'শোরও বেশি। তার মানে এই সাত বছর ধরে প্রতি বছরে প্রায় পঁচিশ জন করে ছাত্র বেড়েছে। ছ'জন নতুন টিচার এসেছে। শুধু এক হিন্দী টিচার ছাড়া আর সবাই বাঙালী। প্রেসিডেণ্ট বিজনবিহারী বাঙালী টিচারদের সবাইকে অনুরোধ করেছিলেন, আপনারা ফ্যামিলি নিয়ে আসুন। বাসা ভাড়ার জন্য মাসে তিন টাকার বেশি লাগবে না। লালাদের পাড়াতে পাঁচ-ছ'টা বাড়ি খালি পড়ে আছে। আমি বলে দিলে সস্তায় ভাড়া দিতে রাজি হয়ে যাবে লালারা।

ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন টিচারেরা। থার্ড টিচার পুষ্কর দত্তের কাণ্ড দেখে খুব খুশী হয়েছেন প্রেসিডেন্ট। মাইনে পঁচিশ টাকা, বয়সেও ছেলেমানুষ বললেই চলে, সংসারের দায় বলতে কি বোঝায় আর ঝুঁকি কত, তা'ও বোধ হয় জানে না; তবু অন্ধ বিধবা মা, একটা বোন আর তিনটে ভাইকে দেশ থেকে আনিয়েছে পুষ্কর। হেড মাস্টার দীনবন্ধুবাবু কিন্তু এরই মধ্যে তিন কাঠা জমি কিনে দুটো ঘর তুলে ফেলেছেন।

কিন্তু ওদিকে, স্টেশনের পূব দিকের সৌখীন জমির প্লট ছাপিয়ে পঞ্চাশটারও বেশি বাড়ি উঠেছে, আরও উঠছে। কলকাতার তিন ব্যারিস্টারের বাড়ি, বর্ধমানের এক জমিদারের বাড়ি, হুগলীর দুই ডাক্তারের বাড়ি। কোলিয়ারীর বাঙালী স্টাফেরাও অনেকে বাড়ি করে ফেলেছেন। রাঁচির মারোয়াড়ীরা যে-সব বাড়ি তৈরি করেছেন, সেগুলির বেশির ভাগই ভাড়া খাটে। আর ভাড়াটেদের বেশির ভাগই বাঙালী। পূজোর সময় আর শীতের সময় হাওয়া-বদলের বাঙালীরা সবচেয়ে বেশি ভিড় করে। কোন বাড়ি আর খালি থাকে না।

শিউলিবাড়ির এই সৌখিন উপনিবেশ, যার নাম ঝুমরা কলোনি, তার কলরবের মধ্যেও মাটিসাহেবের নামটা প্রায় সব সময় বেজেই চলেছে। মাটিসাহেব কি বললেন? মাটিসাহেব কি ধোপা যোগাড় করে দিতে পারলেন? মাটিসাহেবকে বললেই তো হয়, বাসক পাতা আনিয়ে দিতে পারবেন। ঝুনুর জন্যে একজন টিউটর দরকার ছিল; কই? মাটিসাহেব কি ব্যবস্থা করলেন বুঝতে পারছি না। এবার কিন্তু মাটিসাহেব সত্যিই খুব বিশ্বাসী একটা চাকর যোগাড় করে দিয়েছেন। শুনলাম, আজ বিধুবাবুর বাড়িতে ধুনুরী পাঠিয়েছিলেন মাটিসাহেব। আমি অপেক্ষায় আছি, মাটিসাহেবের বাড়িতে হরিণের মাংসের ফীস্ট খেয়ে তারপর কলকাতা রওনা হব। পিসিমার দাঁতের ব্যাথার একটা চমৎকার জংলী ওষুধ এনে দিয়েছেন মাটিসাহেব। মিনতির হারের লকেটটার একটা পাথর খুলে গেছে,

কে জানে মশাই কে সেট করবে? মাটিসাহেব তো বললেন, ভাল স্যাকরা আছে। যাই হক, শুনতে পেলাম, মাটিসাহেব এবার উঠে-পড়ে লেগেছেন, ক্লাবটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়।

শিউলিবাড়ি ক্লাব। একটা ঘরে তুটো আলমারিতে বাংলা বই ঠাসা; আর, একটা ঘরে তাস দাবা আর ক্যারম। বারান্দার সামনে ছোট এক টুকরো মাঠের উপর ব্যাডমিণ্টন। শুধু এক শিউলিবাড়ি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মাটিসাহেবের জীবনের যে পুরো পাঁচটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, আর বয়সটা পঞ্চাশ পার হয়ে আরও পাঁচ বছর এগিয়ে গিয়েছে, এই হুঁশও বোধ হয় মাটিসাহেবের নেই। ক্লাবের সেক্রেটারী হয়েছে যে, ব্যাডমিণ্টনে কলেজ চ্যাম্পিয়ন মোহিত ঘোষ; মাটিসাহেবের প্রায় অর্ধেক বয়সের এমন একটি কাজের মানুষ থাকতেও ক্লাবের বাড়ি তৈরি থেকে শুরু করে সতরঞ্চি কেনা পর্যন্ত সব দরকারের খোরাক যোগাড় করতে গিয়ে ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট মাটিসাহেবকেই একটা রসিদ বই পকেটে নিয়ে ছুটতে হয়েছে, কখনও সিলুয়াড়ি কোলিয়ারীর সাহেবের কাছে, কখনও বা তুধিয়া সিমেণ্ট কারখানার আগরওয়ালার কাছে। সিলুয়াড়ির সাহেব আর তুধিয়ার আগরওয়ালা যদিও তিন টাকা আর তিন টাকা মোট ছ' টাকা দান করেছিলেন, আর নতুন বাঙালী আগন্তুকেরা দান করেছিলেন মোট ছাপান্ন টাকা চার আনা, কিন্তু মাটিসাহেবকে সেজন্য একটুও বিচলিত বা চিন্তিত হতে দেখা যায় নি। রসিদ বইটা পকেটেই থাকে; পথে যেতে যার সঙ্গে দেখা হয়, তার কাছেই চেয়ে বসেন, তু-আনা চার-আনা যা-ই হক, শিউলিবাড়ির ক্লাব ফণ্ডে কিছু দিন মশাই, দিন স্যার, দিজিয়ে লালাজী, দেহা হো মাহাতো; এয়াম কে তিয়াঁ মে!

এষ্টিমেট বলছে আটশো টাকা চাই, কিন্তু এত চেষ্টা করেও যোগাড় হয়েছে, শুধু তুশো ষোল টাকা এগার আনা। বিজনবিহারী হাসেন: ক্লাবটা বেশ ভোগাবে বলে মনে হচ্ছে।

নিরুপমা আশ্চর্য হয়: কোথায় ক্লাব?

—কোথাও নেই ; সেইজন্যেই তো বলছি ; ক্লাবের বাড়ি তৈরির জন্য মাত্র দুশো ষোল টাকা এগার আনা চাঁদা উঠেই বাস, একেবারে থেমে গিয়েছে। অথচ আরও প্রায় ছ'শো টাকা চাই।

—ভাল হয়েছে।

—কি বললে ?

—ওসব এখন থেমে যেতে দাও।

—তুমি তো এক কথায় নিষ্পত্তি করে দিলে। কিন্তু এতদূর এগিয়ে গিয়ে কি থেমে গেলে চলে ?

—না থেমে উপায় কি ? এত টাকা তুমি পাবে কোথায় ?

বিজনবিহারী হাসেন : পাওয়ার সুবিধে আছে বলেই ভাবছি। ফুলনবাবু হ্যাণ্ডনোটে তিন শো টাকা দিতে রাজি আছেন ; আর··· আর ধর এ-বছরের সব অড়হর আর মকাই বেচে আরও দেড়শো টাকা হবে। বাকি রইল দেড়শো টাকা ; সে টাকা তো তোমার কাছ থেকেই ধার পেতে পারি।

নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে হাসছেন বিজনবিহারী, শিউলিবাড়ির মাটিসাহেব, যে-মানুষটার বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে ; মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে হচ্ছে ; আর, গত বছরের ধানবেচা টাকা থেকে মাত্র ওই দেড়শো টাকা বাঁচিয়ে স্ত্রীর কাছে জমা রেখেছেন, মেয়ের গলার একটা সোনার হারের জন্য।

একটি কথাও না বলে ঘরের ভিতরে গিয়ে আর বাক্স খুলে দেড়শো টাকার ছোট্ট পুঁটুলিটাকে বিজনবিহারীর হাতের কাছে ফেলে দিয়ে চলে যান নিরুপমা।

এ তো প্রায় পাঁচ বছর আগের একটা ঘটনা। কিন্তু পাঁচ বছরেও নিরুপমার কাছে সেই দেড়শো টাকা দেনার একটা টাকাও শোধ করতে পারেন নি বিজনবিহারী। এই পাঁচ বছরের মধ্যে সেই টাকার কথা নিয়ে একটিও কথা বলেন নি নিরুপমা। বিজনবিহারী অবশ্য প্রতি মাসেই অন্তত দুবার করে বলেছেন, মনে আছে, মনে আছে নিরু। তোমার টাকা আমি পাই-পাই শোধ করে দেব।

শোধ করতে পারতেন বোধ হয় বিজনবিহারী, যদি একটু জিরোতে জনেতেন কিংবা থামতে পারতেন। শেষ জানা নেই, যেন এই রকম একটি পথে মাটিসাহেবের যত ইচ্ছার চেষ্টার আর কল্পনার প্রাণটা এগিয়ে চলেছে। মাথার অনেকখানি সাদা হয়ে গিয়েছে ; বড়-বড় একজোড়া গোঁফ যেন ঠোঁটের ফাঁকের শান্ত হাসিটাকে অদ্ভুত একটা ছায়া দিয়ে ঢেকে ফেলেছে। মাথায় শোলার হ্যাট, পিঠে বন্দুক, পায়ে বুট, গায়ে খাকি কামিজ আর প্যাণ্ট, মাটিসাহেব তাঁর ছুটোছুটির জীবনের চিরকেলে সহচর সেই সাইকেলের সঙ্গে আজও যেন ছুটেই চলেছেন ; এ সড়কের শেষ মাইল-পোস্ট আর কতদূর ? কিংবা সত্যিই আছে কি না, প্রশ্নটা যেন মাটিসাহেবের জীবনের কোন প্রশ্নই নয়।

মাটি-কাটা ঠিকেদারীর বিলের টাকা, ধানবেচা টাকা, কলাবেচা পেপেঁবেচা টাকা ; এই পাঁচ বছরে টাকা তো বার বার এসেছে। কিন্তু নিরুপমার পাওনা মিটিয়ে দেবার সুযোগ পেলেন কোথায় বিজনবিহারী ?

ক্লাবের বাড়ি তৈরি হয়ে যাবার পর, ক্লাব চালু হবার পর, আর সন্ধ্যায় ক্লাবঘরে দাবার হল্লা হৈ-হৈ করে ওঠবারও পর, পাঁচটা বছর

ধরে যেন আর-একটা মানত পালন করবার জন্যে ছুটোছুটি করছেন আর টাকা খরচ করছেন বিজনবিহারী।

রুদ্রকিশোর হকি শীল্ড। টুর্নামেণ্ট খেলতে টিম পাঠাবে সিলুয়াড়ি কোলিয়ারি, ডুধিয়া সিমেণ্ট ওয়ার্কস, ছুট্‌পা লুথেরিয়ান মিশন। তা ছাড়া আছে শিউলিবাড়ি ইলেভেন। আছে গ্র্যাণ্ড হিরোজ, অর্থাৎ মাটিসাহেবের মুণ্ডা কুলিদের দল থেকে বাছাই করা ছোকরাদের একটা টিম। শীল্ড কিনতে হয়েছে, মস্ত বড় একটা সামিয়ানা কিনতে হয়েছে, পঞ্চাশটা চেয়ার তৈরি করাতে হয়েছে; ছুটো টীমের ইউনিফর্ম কিনতে হয়েছে। সব খরচ মাটিসাহেবের।

ফুলনবাবুর কাছে গল্প করেছে রামসিংহাসন—মাটিসাহেবের হির্‌দয়! কেয়া কহেঁ তসীলদারজী। যেন বাপের কোলঘেঁষা একটা বাচ্চার হৃদয়।

—রুদ্রকিশোর কি মাটিসাহেবের পিতাজীর নাম?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। কবে সেই ছেলেবেলায় বাপ মরে গেছেন, আজ ছেলের মাথার চুলও সাদা হয়ে গিয়েছে; তবু দেখুন, কী হির্‌দয়, বাপের নামটিকেই যেন পূজো করেছেন মাটিসাহেব।

ফাইনাল খেলার দিন এস-ডি-ও এসেছিলেন। সিলুয়াড়ি কোলিয়ারীকে হারিয়ে দিয়ে শীল্ড পেল শিউলিবাড়ি ইলেভেন। এস-ডি-ও'র হাত থেকে শীল্ড উপহার নিয়ে শিউলিবাড়ি ইলেভেনের ক্যাপ্টেন সেই থার্ড টিচার পুষ্কর দত্ত যখন মাথা তুলে আর জয়ীর হাসি হেসে চারিদিকের ভিড়ের দিকে তাকায়, তখন দেখতে পায় রামসিংহাসন, মাটিসাহেব যেন ছটফট করছেন, আর চোখ ছুটো হেসে-হেসে চিকচিক করছে।

সেদিন রামসিংহাসনের বউ বিন্ধ্যাচলীও আর-একজনের চোখ ছুটোকে হাসতে দেখে চমকে ওঠে। অদ্ভুত হাসি; সন্ধ্যাতারার মত মিটিমিটি হাসি নয়; রাতের তারার মত ঝিকঝিক করে হাসছে। রামসিংহাসনের বাড়ির সামনের সড়কের উপর শিউলিবাড়ি রাস্তা

কমিটির সবচেয়ে পুরনো ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সুনন্দা। পাশের শিমূলের একটা শাখা একগাদা লালফুলের ভারে নুয়ে গিয়ে সুনন্দার মাথার উপর আস্তে আস্তে দুলছে। বিন্ধ্যাচলী তার ঘরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে দেখতে পায়, বাঙালীবাবুর মেয়ে নন্দুয়ার মুখটাও যেন শিমূলের ফুলের মত লালচে হয়ে ফুটে রয়েছে।

কি ব্যাপার ? এই তো কিছুক্ষণ আগে বিন্ধ্যাচলীর কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল সুনন্দা। হঠাৎ সড়কের দিক থেকে একটা জয়ধ্বনির হর্ষ উথলে উঠে বাতাস শিউরে দিতেই সুনন্দা যেন ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে সড়কের এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। শিউলিবাড়ি ইলেভেনের জয় হেঁকে চলে যাচ্ছে একটা ভিড়ের মিছিল। আর, রুদ্রকিশোর শীল্ড দু' হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে সবার আগে আগে চলেছে পুষ্কর।

তখুনি একবার বাঙালীবাবুর বাড়িতে গিয়ে নন্দুয়ার মা'কে একটা কথা বলবার জন্য যেন ছটফটিয়ে উঠেছিল বিন্ধ্যাচলী ; কিন্তু যেতে পারে নি ; বিন্ধ্যাচলীর ছটফটিয়ে ওঠা সেই ব্যাকুলতা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

একজনের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে সুনন্দা। রামসিংহাসন বলে, ঝুমরা কলোনিতে থাকে এই ছোকরা বাঙালী, বেশ ভাল একটা চাকরি করে, আর মাঝে মাঝে বাঙালীবাবুর বাড়িতে যায়। ওরই নাম মোহিত, ক্লাবের হিসাব-টিসাব রাখে, আর খুব বই পড়ে।

—আমিও দেখেছি, কিন্তু বাঙালীবাবুর বাড়িতে ওর এত আসা-যাওয়া কেন ?

—নন্দুয়াকে পড়াতে আসে।

রামসিংহাসনের ধারণাটা খুব ভুল ধারণা নয়। বিজনবিহারীর বাড়িতে প্রায়ই আসে মোহিত। আসবার সময় একগাদা বই হাতে নিয়ে আসে, যাবার সময় একগাদা বই হাতে নিয়ে চলে যায়। সুতরাং, সম্পর্কটা পড়া-শোনার সম্পর্ক বলেই তো মনে হয়।

বিন্ধ্যাচলী অপ্রসন্নভাবে বলে, আমার কিন্তু দেখতে কেমন যেন লাগে।

রামসিংহাসন ধমক দেয়—চুপ রহো। যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলো না ; সাবধান।

বিন্ধ্যাচলীর অপ্রসন্নতা ধমক খেয়েও দমে যায় না। রামসিংহাসন তখন শান্ত ভাষায় বুঝিয়ে দেয়।—নন্দুয়া তো তোমার রাজমোহিনীর মত একটা হালুয়াইয়ের মেয়ে নয়, বাঙালীবাবুর মেয়ে। ওদের একটু বেশি বয়সে বিয়ে হয়, আর অনেক লেখা-পড়াও শিখতে হয়।

—কত বেশি বয়স হবে ? নন্দুয়ার বয়স কত হল জান ?

—কত ?

—হিসেব করে দেখ, আমার রাজমোহিনীর চেয়ে চার বছরের ছোট হল নন্দুয়া।

চমকে ওঠে রামসিংহাসন : তবে তো প্রায় পঁচিশ হতে চলল নন্দুয়া। হায় রাম !

ঠিক কথা ; রামসিংহাসনের মনের একটা বিস্ময় যেন আক্ষেপ করে উঠেছে ; এত বয়স হয়ে গেল মেয়েটার ; তবু বাঙালীবাবুর যেন কোন হুঁশ নেই। অন্তত এক মাসের জন্য একবার দেশে গিয়ে মেয়ের বিয়েটা চুকিয়ে দিয়ে আসতে পারে, কিন্তু দেশে যাবার নামও করে না বাঙালীবাবু।

বিন্ধ্যাচলীর মনেরও এটা একটা বিস্ময়। নন্দুয়ার মা আরও অদ্ভুত মানুষ। নন্দুয়ার বিয়ের জন্য একটা সামান্য চিন্তার কথাও নন্দুয়ার মা'র মুখে কোনদিন শোনা গেল না। এত বয়স হয়েছে মেয়ের, তবু মেয়ে যেন কোলের মেয়েটি। একদিন দেখেছে বিন্ধ্যাচলী, নন্দুয়া একটা আসনের উপর বসে বই হাতে নিয়ে পড়ছে, আর নন্দুয়ার মা নিজের হাতে মেয়েকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছেন। বাঙালীবাবুও সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে কি কাণ্ড করেন, সেটাও অনেকবার নিজের চোখে দেখেছে আর নিজের কানে শুনেছে বিন্ধ্যাচলী। ঘরের ভিতরে এদিকে ওদিকে ঘুরঘুর করেন বাঙালীবাবু, আর বাঙালীবাবুর মুখ থেকে যেন একটা আদুরে উৎসবের যত আবোল-তাবোল ভাষা ঝরে পড়তে থাকে—নন্দু, নন্দু, এ বেটি

নন্দুয়া. ও লক্ষ্মী মেয়ে, ও শ্রীমতী সুনন্দা, এক গেলাস জল খাওয়াও তো মা।

—দেখতে কী সুন্দরই না হয়েছে নন্দুয়া! বিন্ধ্যাচলী বলে।—চোখে পড়লে যে রাজামানুষও নন্দুয়াকে বিয়ে করতে চাইবে।

রামসিংহাসন বলে, এরকম একটা ব্যাপারও হয়ে গেছে।

—কি, কি? কবে হল? বিন্ধ্যাচলীর চোখ দুটো উৎসুক হয়ে জ্বলজ্বল করে।

—কুবেরকে চেন? হরচন্দ রায়ের ভাগিনা কুবের?

—হ্যাঁ।

জানে বিন্ধ্যাচলী, শিউলিবাড়ির কে-ই বা না জানে, সিংহানী পাহাড়ের কাছে নতুন কোলিয়ারী খুলেছেন যে পাঞ্জাবী বড়লোক হরচন্দ রায়, যাঁর একটা বাংলো স্টেশনের কাছে দেওদার বাগিচার ভিতরে নানা রঙে রঙীন হয়ে ঝলমল করে, তাঁরই ভগ্নীপতি হলেন এক রাজামানুষ। জলন্ধরে জায়গীরদারী আছে আর গয়াতে আছে জমীদারী। হরচন্দ রায়ের ভাগিনা কুবের পাটনাতে থেকে মস্ত বড় একটা কারবার চালায়। সেই কুবের শিউলিবাড়িতে এসেছিল। আর বাঙালীবাবুর মেয়ে সুনন্দাকে বিয়ে করবার জন্যে ফুলনবাবুর কাছে কথা পেড়েছিল।

—তারপর? তারপর কি হল? প্রশ্ন করতে গিয়ে বিন্ধ্যাচলীর খুশির কৌতূহল যেন চেঁচিয়ে ওঠে।

—তারপর আর কিছু হল না। ফুলনবাবুর বউ নন্দুয়ার কাছে কথাটা বলেছিলেন; কিন্তু···।

—নন্দুয়া কি বললে?

—নন্দুয়া বলেছে; না, কভি নেহি।

বিন্ধ্যাচলী মাথা নাড়ে—তবে তো মনে হয়, ওহি, ওহি বা!

—কওন? কওন?

—মোহিত।

রামসিংহাসন একটা হাঁফ ছেড়ে নিয়ে বলে, হ্যাঁ।

॥ পনর ॥

যে সত্য শুধু রামসিংহাসনের চোখে নয়, শিউলিবাড়ির আরও অনেকের চোখে ধরা পড়েছে, সেটা কি মাটিসাহেবের চোখে ধরা পড়ে নি? যদিও মাটিসাহেবের বয়সটা যাট বছর হতে চলেছে, মাথাটা সাদা হয়ে গিয়েছে; কিন্তু তাঁর চোখ দুটো তো এখনও আলো-মাখানো নীল আকাশের মত হাসে। সন্ধ্যার জঙ্গলের পথে সাইকেল চালিয়ে ছুটে যেতে এখনও যার চোখে কোন অন্ধকার ঠেকে না, এমনই যাঁর চোখের তেজ, সে মানুষ কি এখনও দেখতে পায় নি যে, মোহিতের হাত থেকে বই নেবার জন্য একটা আশার প্রতীক্ষায় কেমন ব্যাকুল হয়ে শিউলির আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায় সুনন্দা; আর সে-সময় সুনন্দার চোখের চাউনিটাও কেমন স্বপ্নালু হয়ে ওঠে?

নিরুপমার মনেও একটা দুঃসহ বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা ছটফট করে। এখনও কি চোখে পড়ল না মানুষটার; মেয়ের গলাটা যে শূন্য। মেয়ের বিয়ের জন্য ভাবনা করবার সময় কি এখনও আসে নি? যেন শিউলিবাড়ির আকাশটার ইচ্ছার কাছে সব আশা সঁপে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছেন মেয়ের বাপ; মেয়ের অদৃষ্টের কি হবে, কি হতে পারে, আর কি হতে চলেছে; এসব যেন মানুষটার কাছে কোন প্রশ্নই নয়।

মেয়ের গলার জন্যে সোনার হার গড়াবার জন্য জমিয়ে রাখা সেই দেড়শো টাকার পুঁটুলিটাকে যে এখনও নিরুপমার হাতে ফিরিয়ে দিতে পারে নি, সেজন্যেও কি বিজনবিহারীর মনে কোন আক্ষেপ আছে? একটুও না। তা না হলে, আজও কেন হেসে হেসে বলে দিতে পারেন, মনে আছে নিরু; সামনে একটা খরচের ধাক্কা আছে, সেটা সামলে নিতে পারলেই তোমার দেনা শোধ করে দেব।

বলতে ইচ্ছা করে নিরুপমার ; ওটা আমার কাছে তোমার দেনা নয় ; ওটা তোমার অদৃষ্টের কাছে তোমার দেনা। কিন্তু বুকের ভিতরে মুখর হয়ে ওঠা এই দুরন্ত প্রতিবাদের শব্দটাকে যেন মুখ চেপে নীরব করে রেখে দেন নিরুপমা।

বিজনবিহারী তো আকাশের ইচ্ছার কাছে সব ছেড়ে দিয়ে আর নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটোছুটি করেন, কিন্তু নিরুপমার চোখ দুটো যে মাঝে মাঝে চমকে ওঠে আর একটা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিথর হয়ে যায়। সন্দেহ না করে পারেন না নিরুপমা, আর সন্দেহ করতেও বুক কাঁপে, বিজনবিহারীর এই নিশ্চিন্ততা যেন একটা অসহায়তা অলস ঘুম ; একটা অক্ষমতার দুঃখ জোর করে ফাঁকির হাসি হাসছে। মেয়ের বিয়ে দিতে কোন চেষ্টাই করতে পারছেন না, এই দুঃসাহসিক মাটিসাহেব ; তাই মিথ্যে নির্ভাবনার কথা দিয়ে ভয় চাপা দিতে চেষ্টা করছেন।

নিরুপমার অভিযোগ যতই বোবা হয়ে থাকুক না কেন, সে অভিযোগের রূপটাকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে পেরেছেন নিরুপমা। তবু বিজনবিহারী দেখতে পেয়েছেন কি না সন্দেহ। নিরুপমার হাতে শুধু একজোড়া শাঁখা ছাড়া আর কিছু নেই। দুলজোড়া খুলে নিয়ে মেয়ের কানে পরিয়ে দিয়েছেন ; নিরুপমার ছ'গাছি সোনার চুড়ি, সেগুলোও সুনন্দারই হাতে উঠেছে।

হেসে ফেলেছিল সুনন্দা।—তুমি নিশ্চয় বাবার ওপর রাগ করে এসব কাণ্ড করছ মা।

নিরুপমা হাসতে চেষ্টা করেন।—ছিঃ, রাগ করব কেন ? আমার আর এসব জঞ্জাল গায়ে রাখতে ভাল লাগে না, লজ্জাও করে।

সুনন্দা আবার হাসে : বেশ কথা বললে ! যদি জঞ্জালই মনে কর, তবে আমার গায়ে চাপাও কেন ? আমিও কি একটা জঞ্জাল ?

কেঁদে ফেলেন নিরুপমা ; দু' হাতে মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেন—ছি ছি ; এমন সর্বনেশে শক্ত কথা বলিস নি নন্দু ; বলতে নেই।

সুনন্দা বলে, কিন্তু তুমি আমার বিয়ের কথা নিয়ে বাবাকে ব্যস্ত করে তুলতে চেষ্টা করো না মা।

—কেন?

—কি দরকার!

—তার মানে কি? তোর বিয়ে হবে না?

—হবে বইকি।

—এর মানেই বা কি?

—এর মানে, ভাবনা করবার কোন দরকার নেই।

সুনন্দার মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন নিরুপমা। কি আশ্চর্য, মেয়েও যে ঠিক বাপের মত মনের জোরের গর্ব দেখিয়ে আর একেবারে ভাবনাহীন হয়ে কথা বলছে! কিন্তু কেন?

সন্ধ্যাবেলা যখন বাড়িতে ফিরে আসেন বিজনবিহারী, আর, সুনন্দার গাল টিপে যত আবোল-তাবোল আদরের বোল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, তখন ডাক দেয় নিরুপমা, শুনছ?

—হ্যাঁ।

—শুনে যাও।

—কি ব্যাপার?

—নন্দু এসব কি কথা বলছে?

—কি কথা?

—বলছে, বিয়ে হবে, ভাবনা করবার কোন দরকার নেই।

—বলেছে নাকি?

—হ্যাঁ।

—তবে ঠিকই বলেছে।

—তার মানে?

—তার মানে, মোহিত নন্দুকে বিয়ে করতে চায়।

বিজনবিহারীর স্নিগ্ধ চোখে নতুন এক সূর্যোদয়ের আভা হাসছে। আর, মুখের উপর জয়গর্বের প্রসন্নতা। যেন জানাই ছিল বিজন-বিহারীর, অলক্ষ্য একটা আশীর্বাদের হাত নন্দুর মাথায় ধানদূর্বা

ছড়িয়ে দেবার জন্য তৈরি হয়েই আছে। ভাবনা করবার কিছু নেই পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মনপ্রাণ আর শরীরটাকে একমুহূর্তের জন্যও জিরোতে না দিয়ে, যত সাধ স্বপ্ন আর আশার মাটি ফেলে ফেলে শিউলিবাড়ি নামে যে মায়ার দেশ নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন মাটিসাহেব, সে দেশের সব আলো-ছায়ার কাছে মাটিসাহেব যে সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধার মেয়েকে বরণ করে ঘরে তুলে নেবার মত মানুষ আছে। এখানেই আছে। এখানে শাস্তর আর মন্তরকেও যে ডেকে এনে বিজনবিহারী তাঁর গায়ের জোরে জায়গা করে দিয়েছেন। সুনন্দার বিয়ে ঠিক হয়েছে জানতে পেলে চক্রবর্তী যে এখনই পাঁজি হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসবে। সেনবাবুর মেয়েরা বোধ হয় এখনই শাঁখ বাজাতে শুরু করে দেবে। সুচেত সিং এখনি এক ঝুড়ি ফল পাঠিয়ে দেবে; হেডমাস্টার দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী উলু দিয়ে ফেলবে, আর রামসিংহাসনের বউ গলা খুলে গান গেয়ে উঠবে—কেকর ঘর চলি সীয়া, কেকর ঘর চলি! আর, থার্ড টিচার পুষ্করও বোধ হয় ছুটে এসে খোঁজ নেবে, বিয়ের কাজে খাটতে চাইবে। ব্যাণ্ড পার্টি যদি আনবার দরকার হয়; তবে বলা মাত্র রাঁচি চলে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফিরে আসবে পুষ্কর।

নিরুপমা হাসেন, বিন্ধ্যাচলী সেদিন একটা অদ্ভুত কথা বলছিল।

—কি?

—হরচন্দ রায়ের ভাগ্নে কুবের নাকি নন্দুকে বিয়ে করবার

—না না, কখ্‌খনো না। কি ভেবেছে হরচন্দ রায়, বাংলা দেশে কি মানুষ নেই?

—সে কথা চুকে গিয়েছে। ফুলনবাবুর বউ একদিন নন্দুকে কথাটা বলেছিল।

—তারপর?

—নন্দু জবাব দিয়ে দিয়েছে, না।

বিজনবিহারীর মুখের হাসিতে সেই জয়গর্বের প্রসন্নতা যেন আরও

নিবিড় হয়ে টলমল করে।—ওরা বুঝতে খুব ভুল করেছে। আমি যে একটা খাঁটি বাঙালী, আর নন্দু যে মনেপ্রাণে একটা বাঙালী মেয়ে, এটা বোধ হয় ওরা ঠিক ধরতে পারে নি। যাই হক…।

কি-যেন ভাবতে থাকেন বিজনবিহারী; আর চোখ-মুখের প্রসন্নতা আরও স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে থাকে: আজকাল আমার কি মনে হয় জান নিরু?

—কি?

—মোহিতের মুখটার দিকে যখন তাকিয়ে থাকি, তখন মনে হয়, আমাকে আর তোমাকে কেউ যেন ক্ষমা করে আর খুশি হয়ে একটা আশীর্বাদ পাঠিয়েছে।

—কি বললে? কে পাঠিয়েছে? নিরুপমার চোখ দুটো থর থর করে কেঁপে ওঠে।

—ছোড়দা পাঠিয়েছে।

নিরুপমার চোখে যেন একটা অবুঝ শূন্যতা শুধু ফ্যালফ্যাল করে; কিছুই বুঝতে পারছেন না নিরুপমা, কি বলতে চাইছেন বিজনবিহারী। শিউলিবাড়ির এই জীবনে, এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম ছোড়দার কথাটা বিজনবিহারীর মুখে হঠাৎ ডুকরে উঠেছে।

নিরুপমা বলে, আজ হঠাৎ ছোড়দা কেন…।

এক হাতে সাদা মাথাটা, আর এক হাতে ধবধবে ফর্সা বুকটাকে চেপে ধরে ষাট বছর বয়সের মাটিসাহেব হঠাৎ ছোট ছেলের মত চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন।—ছোড়দা আর নেই, নিরু। খবর পেলাম কেষ্টনগরের কমলকিশোরবাবু আজ পাঁচ বছর হল মারা গেছেন।

নিরুপমা দু হাত দিয়ে চোখ মুখের উপর আঁচলটাকে শক্ত করে চেপে ধরে করুণ গুঞ্জনের মত মৃদু একটা কান্নার স্বর চেপে রাখতে চেষ্টা করেন।

আতঙ্কিত হয়ে ছুটে আসে সুনন্দা। বিজনবিহারীর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে, কি হল বাবা? শিগ্‌গির বল, কি হল?

বিজনবিহারী তখনই শান্ত হয়ে, আর ফুঁপিয়ে ওঠা বুকের

কষ্টটাকে নিজেই হাত বুলিয়ে যেন ভুলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকেন—কে চলে গেছেন ; কিছুই বুঝতে পারলি না নন্দু।

—কে বাবা ?

—তোর জেঠু রে নন্দু।

এ কেমন জেঠু ? এত বড় মায়ার এক জেঠু পৃথিবীতে কোথাও ছিল, এ সত্য তো কোনদিন শুনতে পায় নি সুনন্দা।

শুনতে পায় নি, জানতে পায় নি, কেউ বলে নি, ভালই ছিল। আজও না শুনতে পেলে ভালই হত। সুনন্দাকে তা হলে আজ দু' চোখ ভরে এত করুণ একটা বিস্ময়ের বেদনা দিয়ে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকাতে হত না। বিজনবিহারীকেও একটা করুণ বিস্ময় বলে মনে হত না। আজ নয়, সেই আট বছর বয়সের একটি দিনে, যেদিন চক্রবর্তী ঠাকুরের মেয়ে অঞ্জলির জন্য দেশের বাড়ি থেকে আমসত্বের ছোট্ট একটা পার্সেল এসেছিল, সেদিন নিরুপমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে যে সত্য জেনেছিল সুনন্দা, সেটা হল একটা অদ্ভুত দুঃখের সত্য। দেশ থাকতেও দেশ নেই ; আপনজন বলতে কেউ নেই। না রে নন্দু, তোর বাবার বাড়িতেও কেউ নেই, মামাবাড়িতেও কেউ নেই যে, তাকে আদর করে আমসত্ত্ব পাঠাবে।

সুনন্দা যেন ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করে।—আমার কেমন জেঠু, বাবা ?

নিরুপমাও যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন, তোর আপন জেঠু।

—কিন্তু একটা খুব দুঃখের ঝগড়ার জন্য ভাইয়ে-ভাইয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, তাই তোর বাবার মুখে কোনদিন জেঠুর কথা শুনতে পাস নি।

সুনন্দা চলে যায়। খাটের উপর উঠে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েন বিজনবিহারী। হাত-পা গুটিয়ে, মাথাটাকে কেমন-যেন অলসভাবে এক পাশে এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকেন। মাটিসাহেবের এই শক্ত পোক্ত চেহারাটা কি-অদ্ভুত একটা ছেলেমানুষী চেহারা !

নিরুপমা বলেন, আঃ, এ কি রকমের শোওয়া? হাত-পা মেলে একটু টান হয়ে শোও; আমি বাতাস দিই।

চোখ দুটোকে যেন ছলছলিয়ে হাসতে থাকেন বিজনবিহারী। ষাট বছর বয়সের সাদা মাথাটাও অদ্ভুতভাবে দুলতে থাকে।—ইচ্ছে করছে, ছোড়দার পিঠের কাছে মুখ গুঁজে দিয়ে শুয়ে থাকি।

পাখাটা হাতে তুলে নিয়ে জোরে-জোরে বিজনবিহারীর সেই চোখের উপর বাতাস দিতে থাকেন নিরুপমা। চোখ বন্ধ করে আর নিঝুম হয়ে পড়ে থাকেন বিজনবিহারী।

কিন্তু কতক্ষণ? বড়জোর এক মিনিট। নিরুপমা জানেন, বিজনবিহারীর এই এক মিনিটের নিঝুম হয়ে পড়ে থাকা স্তব্ধতা যে ধড়ফড়িয়ে জেগে ওঠারই লক্ষণ। বিজনবিহারীর দুরন্ত আত্মাটা যেন স্বপ্নের একটা ছবিকে চকিত চোখে একবার দেখে নেবার জন্য এক মিনিটের জন্য শান্ত হয়, তারপরেই ব্যস্তভাবে কাজ খোঁজে।

কাজ হল সেই সব কাজ; শিউলিবাড়ি ক্লাবের লাইব্রেরী ঘরে বিবেকানন্দের একটা ছবি দরকার। একবার দেখে আসা দরকার, মিসরাতু আর কুলডিহার মেয়েগুলো মুড়ি ভাজতে পারল কি না? ভুলাই ঝিলের কালবোশ কত বড় হল? স্টেশনের গাঙ্গুলীবাবু খবর দিয়েছেন, কাটোয়া থেকে একজন বাউল এসেছে, চমৎকার গান গায় আর নাচে। বললে কি রাজি হবে না কাটোয়ার বাউল, শিউলি-বাড়িতেই একটা আখড়া করে থেকে যেতে?

তা ছাড়া আরও একটা কাজ আছে। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেন বিজনবিহারী। নিরুপমা বলেন, কি হল? উঠে পড়লে কেন?

—এখনি একবার ঘুরে আসি।

—কোথায়?

—এই ওখানে। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান কৈলাসবাবু আজ ফুলনবাবুর বাড়িতে এসেছেন।

নিরুপমা আর কোন প্রশ্ন করেন না। প্রশ্ন করে লাভ নেই। জিরোতে জানে না, থামতে জানে না, ঝিমোতে পারে না, এই

রকম একটি স্বভাবের মানুষকে আর বেশি প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই।

প্রশ্ন না করলেও জানতে বেশি দেরি হয় নি নিরুপমার। মাত্র আর সাতটা দিন পরে, বাড়ি ফিরেই, যেন একটা কৃতার্থ খুশির উল্লাসের মত হেসে-চেঁচিয়ে হাঁক-ডাক করতে থাকেন বিজনবিহারী।

—শুনছ? তুমি কোথায় নিরু? নন্দু আছিস নাকি?

—কি হল?

—পুকুরটার নাম কমলসাগর হয়ে গেল।

—কি বললে?

হেসে হেসে চিকচিক করে বিজনবিহারীর চোখ।—পানীয় জলের জন্য যে পুকুরটা কাটিয়েছে জেলা বোর্ড; তার ঘাট তৈরির সব খরচ আমি দিয়েছি। কাজেই কৈলাসবাবু আমার কথা রেখেছেন। আমার পছন্দমত নামটাকেই মেনে নিয়েছেন। তুই বুঝলি কিছু নন্দু?

—বুঝেছি।

—কি বুঝেছিস? কমলসাগরের কমল মানে কি? পদ্মফুল?

সুনন্দা হাসে: না, মানে হল জেঠুর নাম।

॥ ষোল ॥

কমলসাগরের নতুন ঘাটের কাছে ছোট্ট একটি ল্যাম্পপোস্টের মাথায় টিমটিম করে কেরোসিনের বাতি জ্বলে। তার পাশেই দুটো কল্‌কে ফুলের গাছ। গাছের ছায়ার উপর লুটিয়ে পড়ে আছে বাসী ফুল। আর গাছের সেই ছায়ার কাছে আরও দুটো ছায়া; যাদের ছায়া, তাদের চোখে আকাশ ছাপিয়ে উথলে পড়া পূর্ণচাঁদের আলোর মত খুশির আলো ঝলমল করে। মোহিত আর সুনন্দা।

একটা বাসী কল্‌কে ফুল জুতো দিয়ে চেপে আর চটকে দিয়ে মোহিত বলে, এগুলোই বোধ হয় হলদে করবী।

সুনন্দা বলে, হবে। আমি তো এগুলোকে কাণ্ডিল ফুল বলে জানতাম।

মোহিত হাসে, এখন নতুন করে জানলে তো?

—হ্যাঁ।

—কি?

—তুমি যা জানিয়ে দিলে।

—কি জানালাম?

হেসে ওঠে সুনন্দা: হলদে করবী।

মোহিতও খুশি হয়ে বলে, সত্যিই শিউলিবাড়ির অশিক্ষার মধ্যে থেকে থেকে তোমার ভাষাও যেন কেমনতর হয়ে গিয়েছিল।

সুনন্দার চোখে যেন বিচিত্র এক কৃতজ্ঞতার হর্ষ চমকে ওঠে।—তুমিই তো শুধরে দিয়েছ।

মোহিতের অভিযোগের কথা আর সুনন্দার কৃতজ্ঞতার কথা, দুইই বর্ণে বর্ণে সত্য। মোহিত যদি শিউলিবাড়িতে না আসত, আর মাটিসাহেবের এই মেয়েকে এত ভালবেসে না ফেলত, তবে সুনন্দা আজ এই কমলসাগরের ঘাটের এই হলদে করবীর কাছে

দাঁড়িয়ে মোহিতের কানের কাছে এমন ভাষায় কখনই কথা বলে দিতে পারত না, আমি তো একটা মরচে-পড়া লোহা হয়ে এখানে পড়েছিলাম, মোহিত ; তুমি পরশমণির মত আমাকে ছুঁয়ে দিয়ে সোনা করে দিয়েছ। আমার প্রাণটা যে তোমার কাছে চিরকালের ঋণী হয়ে গেছে।

শিউলিবাড়িতে এসেছে মোহিত, যদিও চিরকাল শিউলিবাড়িতে থাকবার জন্যে আসে নি। তবু এই সত্য আবিষ্কার করেছে মোহিত, চিরকালের আপন করে নেবার মত একটা রূপের ছবি যেন এই শিউলিবাড়িতে আছে। বছরের পর বছর তো শুধু অদ্ভুত একটা ব্যাকুলতার নিশ্বাস চেপে আর দূর থেকে সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়েছে মোহিত। তারপর একটা বছর ধরে শুধু চিঠি লিখে যেন একটা স্বপ্নের কাছে আবেদন করেছে।—আমার ভালবাসাকে অপমান করো না সুনন্দা ; যা হক কিছু একটা উত্তর দিয়ো।

শেষে উত্তর দিয়েছিল সুনন্দা ঃ আপনি দয়া করে আমাকে আর চিঠি লিখবেন না। আমার বড় ভয় করে।

সুনন্দার সেই ভয়ের চিঠিই যেন ভালবাসার পথের ভয়টাকে দূরে সরিয়ে দিল। ক্লাবের সেক্রেটারী মোহিত ঘোষ প্রেসিডেন্টের বাড়িতে এসে, প্রেসিডেন্টের মেয়ের হাতে এক গাদা বই তুলে দিয়ে চলে গেল। সেদিন বুকের সব নিশ্বাসের ভার মৃদু করে দিয়ে সুনন্দার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে একটা কথাও বলে দিতে পেরেছিল মোহিত—আমাকে ভয় করবার কোন মানে হয় না সুনন্দা।

ঝুমরা কলোনিতে একটি বাংলো বাড়ি ভাড়া নিয়ে একাই থাকে মোহিত ঘোষ। ক্লাবটার উন্নতির জন্য অনেক চিন্তা করেছে এবং আজও করে। মোহিতের মন যেমন, রুচিও তেমন, আর জীবনের ভঙ্গীটাও তেমনই পরিচ্ছন্ন। ক্লাবের জন্য যেটুকু কাজ করে, সেটাও একটা পরিচ্ছন্ন কাজ। মাঝে মাঝে সভা-সম্মেলন ডাকে মোহিত। সভায় একমাত্র বক্তাও মোহিত। সেনবাবু আর গাঙ্গুলীবাবু আসেন।

চক্রবর্তী আসেন। হেডমাস্টার দীনবন্ধু আর অন্য সব টিচারেরাও আসেন। আসে থার্ড টিচার পুষ্কর দত্ত। ফুলনবাবুও মাঝে মাঝে আসেন। এমন কি রামসিংহাসনও কয়েকবার এসেছে।

—আমাদের এই শিউলিবাড়ির সবই ভাল। সবই আছে এখানে। অভাব শুধু একটি ; শিক্ষার অভাব।

মোহিতের বক্তৃতা শুনে ফুলনবাবু মাথা নেড়ে সায় দেন।—ঠিক কথা।

গাঙ্গুলীবাবু বলেন, খুব ঠিক কথা।

—সমস্যা এই যে, শিউলিবাড়ির মন এখনও এক যুগ পিছনে পড়ে আছে। আজকের দিনের চিন্তা ইচ্ছা রুচির কোন খবর রাখে না শিউলিবাড়ি।

একথাটাও বর্ণে বর্ণে সত্য। সভা শেষ হলে দীনবন্ধুবাবু আর সেনবাবু আলোচনা করেন, শিউলিবাড়ি যদি পিছিয়েই না থাকবে, তবে এখানে ওই এক মোহিতের মত একটি ছেলে ছাড়া দ্বিতীয় এমন একটি ছেলেকে দেখতে পাওয়া যাবে না কেন, যে-ছেলের বিদ্যা বুদ্ধি আর চরিত্র দেখে গর্ব করতে পারে আর অনেক কিছু শিখতে পারে শিউলিবাড়ি ?

চক্রবর্তী একটু চাপা-গলায় ফিসফিস করে গাঙ্গুলীবাবুর কাছে কি-যেন বললেন। গাঙ্গুলীবাবু হেসে ফেলেন—সেটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু একটা সমস্যা কি জানেন, পুষ্কর তো ঠিক এরকম শিক্ষিত ছেলে নয় ; অন্য যতই গুণ থাকুক না কেন। শিউলিবাড়ির বাঙালীদের মান বাড়াবে, এমন যোগ্যতা পুষ্করের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

গাঙ্গুলীবাবু নিজের চোখে দেখেছেন, মোহিতের ঘরে একটি আলমারি ভর্তি কি রকমের আর কত রকমের বই আছে।—দেখে আশ্চর্য হয়েছি দীনবন্ধুবাবু, এই বয়সের ছেলে যে এত বিদ্যে ভালবাসে এমনটি আমি আর কোথাও দেখি নি মশাই। হ্যাঁ, দেখেছিলাম বটে, আমাদের রামপুরহাটের চাটুজ্জে মশাইকে ; ঘরভর্তি বইয়ের মধ্যে

ডুবে রয়েছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পেনসনী প্রফেসর ; মোহিতের মত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের একটা মানুষ তো নয়।

—মোহিত বোধহয় এম-এ।

—হ্যাঁ।

—চাকরিটাও তো বেশ ভাল মাইনের চাকরি।

—না, ঠিক চাকরি নয়। হিসেব অডিট করার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করে মোহিত। ধরুন, শুধু এক সিলুয়াডি কোলিয়ারির হিসেব অডিট করে বছরে দেড় হাজার টাকা পায়। তা ছাড়া ডুধিয়া সিমেণ্ট আছে, সিংহানি কোলিয়ারি আছে। সবারই কিছু না কিছু কাজ করে দেয় মোহিত। সব নিয়ে বেশ ভাল আয় হয়।

—বাঃ, চমৎকার ভাগ্যবান ছেলে।

—কৃতী ছেলে।

—কিন্তু···।

—কি ?

—একা-একা ওভাবে পড়ে আছে কেন ? বাপ-মা নেই ?

—তা জানি না।

—কথা হল, মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে সত্যিই কি...।

—তাও জানি না মশাই।

—কিন্তু না জানবার আর কি যুক্তি আছে ? কে না দেখেছে, সুনন্দা আর মোহিত কমলসাগরের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায় আর গল্প করে ? কে না দেখেছে, মাটিসাহেবের বাড়ির বারান্দায় চেয়ারের উপর বসে আছে মোহিত, আর সুনন্দা ভিতর থেকে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বের হয়ে এসে মোহিতের কাছে দাঁড়িয়েছে ?

শ্রাবণ শেষ হয়ে ভাদ্রের রোদ আর গুমোট যখন দেখা দিল, আর সারা শিউলিবাড়ির ঘরে ঘরে একটা জ্বরের উৎপাতও দুরন্ত হয়ে উঠল, তখন ঝুমরা কলোনির প্রণববাবুর স্ত্রীও নিজের চোখে দেখতে পেয়েছেন, মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দা একাই হেঁটে হেঁটে সেই

বাংলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকল, যেটা হল মোহিত অডিটারের বাংলো, যেটার বাইরের ঘরটা হল অফিস ঘর; আর ভেতরের ঘরটা··· কে জানে কি দেখেছেন বিরাজ মাসিমা···যে জন্যে ঘরটাকে একেবারে বাসরঘরের মত একটা সাজানো ঘর বলে তাঁর চোখে ঠেকেছে।

বিরাজ মাসিমার কাছ থেকেই জানতে পেলেন প্রণববাবুর স্ত্রী, মোহিতের জ্বর হয়েছে; তাই মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দা বার বার মোহিতকে দেখতে আসছে।

—কেন?

—কি করে বলব বল? সুনন্দার হাতে অবশ্য মস্ত বড় একটা কাচের বাটি দেখলাম। বোধ হয় সাগু, কিংবা পথ্যি-টথ্যি পৌঁছে দিল।

—কিন্তু এরকম সেবা-টেবার একটা মানে আছে তো?

—আছে বইকি। থাকলেই ভাল। বিরাজ মাসিমা তাঁর নাতিকে কোলে তুলে নিয়ে আবার ব্যস্তভাবে চলে যান।

কিন্তু ভাদ্রের গুমোট ভেঙে দিয়ে আশ্বিনের আকাশ যখন হেসে উঠেছে, শিউলিবাড়ির কোন ঘরে যখন জ্বর-জ্বালা নেই, আর মোহিত অডিটারকেও যখন দেখা যায়, ব্যাডমিণ্টনের ব্যাট হাতে নিয়ে ক্লাবের দিক থেকে ব্যস্তভাবে হেঁটে নিজের বাংলোতে চলে যাচ্ছে, তখন তো কারও বাড়িতে সাগু বা পথ্যি-টথ্যি পৌঁছে দেবার দরকার নেই; তবে কেন মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দাকে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক মোহিতের বাংলোর দিকে যাবার রাস্তাটি ধরে একমনে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে?

বিরাজ মাসিমা বলেন, সবই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

প্রণববাবুর স্ত্রী বলেন, আমি তো সব বুঝেছি; কিন্তু বিয়েটা কবে?

—সে সব কথা এখনও কিছুই শুনতে পাই নি।

মাটিসাহেবের মেয়ের সঙ্গে অনেকবার কথা বলেছেন প্রণববাবুর

স্ত্রী, কথা বলেছেন বিরাজ মাসিমা; কিন্তু দুজনেই দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছেন, কি-ভয়ানক ভীরু আর লাজুক এই মেয়ে, যার বয়স তো অন্তত কুড়ি-পঁচিশ হবে। যে কাণ্ডটাকে চোখের উপর দেখছেন, সে কাণ্ডটাকে দেখতে একটুও ভাল লাগে না, পছন্দ করেন না; কিন্তু মেয়েটাকে ভাল লাগে। বিরাজ মাসিমা নিজেও বলেছেন, কি আশ্চর্য, মেয়েটার ওপর আমার কিন্তু একটুও রাগ হয় না।

আজও আবার দুজনেই দেখতে পেয়েছেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন, তবু মাটিসাহেবের মেয়ে এতক্ষণ ওখানেই ছিল নিশ্চয়, তা না হলে ওদিক থেকে আসবে কেন?

প্রণববাবুর স্ত্রী হেসে-হেসে জিজ্ঞেস করেন, লাহাবাবুদের বাড়িতে ঠাকুরের আরতি দেখতে গিয়েছিলে নিশ্চয়; দেখে কেমন লাগল সুনন্দা?

চমকে ওঠে সুনন্দা: আজ্ঞে না; আমি তো ঠাকুরের আরতি দেখতে যাই নি।

বিরাজ মাসিমা বলেন, না না; সুনন্দা গিয়েছিল নিশিবাবুর ছেলের বউ মালতীর সঙ্গে গল্প করতে।

—না, মালতীকে আমি তো চিনি না।

—তবে কোথায় গিয়েছিলে?

—মোহিতবাবুর কাছে।

—মোহিতের মা এসেছেন বুঝি?

—না। বলতে গিয়ে সুনন্দার মাথাটা যেন হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়তে চায়। দু'চোখে একটা ভীরু লজ্জার ভার টলমল করে। আর সারা মুখ লালচে হয়ে ওঠে।

প্রণববাবুর স্ত্রী যেন খুশি হয়ে হাসেন: তা বেশ। কিন্তু তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন?

—ভালই তো।

প্রণববাবুর স্ত্রী আবার হাসেন: বিয়েটা কবে হবে, তাই বল

ওঁর ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগেই যদি বিয়েটা হয়, তবে তোমার বিয়েতে উলু দিয়ে তারপর কলকাতা ফিরব।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা।

বিরাজ মাসিমা বলেন, আঃ, মেয়েটাকে আর লজ্জা দিয়ো না হারুর মা; দিন ঠিক হলে জানতেই পারা যাবে। মাটিসাহেবের মেয়ের বিয়েতে কি শিউলিবাড়ির কারও নেমন্তন্ন বাদ যাবে?

ঝুমরা কলোনির প্রণববাবুর স্ত্রী আর বিরাজ মাসিমার জিজ্ঞাসার কাছে আজ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে নি সুনন্দা। লাজুক মুখটাকে লুকোতে গিয়ে মাথাটা ঝুঁকে গিয়েছিল; মাথা পেতে যে ভাগ্যটাকে বরণ করে নিতে হবে, যেন তারই একটা শুভ সঙ্কেত জানিয়ে দিতে পেরেছে সুনন্দা; যদিও একটিও কথা বলতে হয় নি। লোকের চোখের কাছে সুনন্দার এই প্রথম স্বীকৃতি। প্রণববাবুর স্ত্রী আর বিরাজ মাসিমার ধারণার উল্লাসটাকেও মাথা পেতে বরণ করে নিয়েছে সুনন্দা।

আশ্বিনের আকাশে অনেক তারা হাসছে। ঝুমরা কলোনির বাতাসে হাস্নুহানার গন্ধ মাঝে মাঝে উতলা হয়ে উঠছে। দস্তিদার সাহেবের বাড়ির ফটকের আলোর কাছে মাধবীলতার ফুলগুলি যেন ফুটন্ত লালমাণিকের থোকা হয়ে দুলছে। কাঁকরের রাস্তাটা ফুরিয়ে যায়, তবু মনে হয় সুনন্দার, ঝুমরা কলোনির হাস্নুহানার গন্ধ যেন এখনও নিশ্বাসের বাতাসে ছুটোছুটি করছে।

মোহিতের ভালবাসার কাছে মাথা পেতে দিতে হয়েছে; যেমন আজ, তেমনি সেদিনও, সেই প্রথম, সাগুর বাটি হাতে নিয়ে মোহিতের বিছানার কাছে যেদিন দাঁড়িয়েছিল সুনন্দা। তিন দিনের জ্বরে কি ভয়ানক ঘোলা হয়ে গিয়েছিল মোহিতের সেই কালো-কালো বড়-বড় চোখ। কিন্তু মোহিতের সেই জ্বরের চোখে কি-অদ্ভুত পিপাসা ছটফট করে উঠেছিল। কত শক্ত করে হাতটা চেপে ধরল মোহিত; আর অবুঝের মত কত কথাই না বলল। সত্যি, ভালবাসা একটা অবুঝ পিপাসাই বটে; হাস্নুহানার পাগল গন্ধের চেয়েও উতলা। তা না হলে সাগুর বাটির দিকে না তাকিয়ে সুনন্দার সেই ভীরু মুখের উপর সব পিপাসা ঢেলে দেবে

কেন মোহিত? আর সুনন্দাই বা কেন হাত ছাড়িয়ে নিতে পারবে না?

সুনন্দাকে সরে যেতে দেয় নি মোহিত, সুনন্দাও সরে যায় নি। ভয়ে বুক কেঁপে উঠেছিল সুনন্দার; মনে হয়েছিল একটা সর্বনাশের উৎসব যেন সুনন্দার প্রাণটাকে মোহিতের বিছানার উপর লুটিয়ে দিয়ে স্তব্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু মোহিত যখন হেসে-হেসে নিজেরই হাতে সুনন্দার চোখের জল মুছে দিল, তখন সুনন্দার ভিজে চোখও হেসে উঠেছিল। মোহিতের মুখটা যে সান্ত্বনাময় একটা অঙ্গীকারের ফুল; মাধবীলতার ফুলের চেয়েও রঙীন হয়ে আর লালমাণিকের আভা ছড়িয়ে হাসছে। —আমাকে ভয় করলে কিংবা লজ্জা করলে যে আমার ভালবাসাকে অপমান করা হয়, সুনন্দা।

ঠিকই, সুনন্দার মনের অবুঝ ভয় আর শরীরের অবুঝ লজ্জাটা বুঝতে পেরেছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে। যার ঘরে চিরকালের ঠাঁই নিতে হবে, তার ঘরে এসে প্রাণটা যদি একটু অসাবধান হয়ে যায়, তবে যাক না; ক্ষতি কি?

স্টেশন রোডের আলোগুলিও যেন আজ বড় বেশি ঝলমল করছে। এগিয়ে যেতে থাকে সুনন্দা। কিন্তু এ কি? কি সুন্দর সুরের একটা বাংলা গানের ভাষা বাতাসে ভেসে আসছে। আশ্বিনের আকাশটাও কি আজ গান গাইতে শুরু করেছে? কে গাইছে? কলের গান বোধ হয়।

মোড় ঘুরে স্টেশন রোড ছেড়ে দিয়ে ধর্মশালা যাবার ছোট রাস্তাটার দিকে এগিয়ে যেত সুনন্দা, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। মোড়ের উপরে সড়কের পাশের একটি ঘরে ফুল আলো আমপাতা আর চাঁদমালায় সাজানো একটা উৎসব যেন গান গাইছে। ছোট্ট একটা দোকান ঘর। কিসের দোকান?

গ্রামোফোন আর রেকর্ডের একটি দোকান। দুটো আলমারি আর একটা টেবিল। চারটি চেয়ার, এক গুচ্ছ ধূপকাঠিও পুড়ে

পুড়ে সুগন্ধের ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। টেবিলের উপর একটা ঝকঝকে গ্রামোফোন গলা খুলে গান গাইছে।

—আসুন না?

অদ্ভুত স্বরের একটা আহ্বানের ভাষা যেন আচমকা বেজে উঠেছে। চমকে ওঠে সুনন্দা।

সুনন্দার একেবারে চোখের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে-হেসে কথা বলছে রমাসুন্দরী বেঙ্গলী মাইনর স্কুলের থার্ড টিচার পুষ্কর দত্ত।—আজ দোকান প্রতিষ্ঠা হল। এই তো কিছুক্ষণ আগে পূজো শেষ করে চক্রবর্তী ঠাকুর চলে গেলেন।

সুনন্দাও হাসতে চেষ্টা করেঃ গানের রেকর্ডের দোকান বোধ হয়।

—হ্যাঁ। বাংলা হিন্দী এমন কি ইংরেজি রেকর্ডও আছে। তিনটে রেকর্ড কোম্পানির এজেন্সি পেয়েছি। সিলুয়াডির সাহেবরা আজই প্রায় তিন শো টাকার রেকর্ডের অর্ডার দিয়েছেন।

—আপনি কি তবে স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়ে···।

—না না, স্কুলের কাজ তো আছেই। আমার দুটি ভাই আছে; ওরা সকাল-বিকেল দোকান দেখবে; আমি শুধু সন্ধ্যেবেলা এসে ওদের ছুটি দেব। দেখা যাক, কি হয়?

—আচ্ছা, আমি চলি।

—দোকানটা একটু দেখবেন না?

—না।

ব্যস্তভাবে চলে যায় সুনন্দা। কিন্তু রাস্তাটা কি বিশ্রী অন্ধকারে ভরে রয়েছে! পুষ্করের দোকানের আলোর দিকে এতক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকাই ভুল হয়েছে; তা না হলে চোখ দুটো এত ধাঁধিয়ে যেত না; আর চোখের সামনের এই রাস্তাটাকে এত অন্ধকারে ঢাকা একটা শূন্যতা বলেও মনে হত না।

বাড়ি ফিরে গিয়ে অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে থেকে, তারপর আনমনার মত ঘরের ভিতরে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে, যখন জানলাটার

কাছে এগিয়ে এসে, আর অদ্ভুত একটা ক্লান্তির আবেশে অলস হয়ে যাওয়া হাত দুটোকে কোন মতে তুলে নিয়ে খোঁপা খুলতে থাকে সুনন্দা, তখন বাইরের বারান্দাতে একটা চকিত উল্লাসের শব্দ হো-হো করে হেসে ওঠে। যেন একটা খুশির আবেশে গলে গিয়ে হাসছেন আর কথা বলছেন বিজনবিহারী। সুনন্দার আনমনা চোখের দৃষ্টিতে দুঃসহ আর বিশ্রী একটা সন্দেহ চমকে ওঠে। পুষ্কর দত্ত এসেছে বোধ হয়।

যে এসেছিল সে এইবার চলে গেল বোধ হয়। তাই ঘরের ভিতরে ঢুকলেন বিজনবিহারী, আর সুনন্দার দিকে তাকিয়ে যেন বুকভরা একটা খুশির হাসি উথলে দিলেন : পুষ্কর আমাকে উপহার দিয়ে গেল নন্দু। রামপ্রসাদী গানের পাঁচটা রেকর্ড।

রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে থাকেন বিজনবিহারী : ওঃ, পুষ্কর আমার খুব উপকার করল। এতদিন ধরে রাগ করে শুধু ইংরেজি গানের যত হালালালা শুনেছি, কান পচে গিয়েছে।

তখনি গ্রামোফোনটার কাছে বসে রামপ্রসাদী গানের রেকর্ড বাজাতে শুরু করেন বিজনবিহারী।—আঃ, বলিহারী, কী মিষ্টি গান! এইবার পেটভরে বাংলা গান শোনা যাবে।

রামপ্রসাদী গান কখন থেমেছে, বোধ হয় বুঝতে পারে নি সুনন্দা। কতক্ষণ ধরে চুপ করে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আশ্বিনের আকাশের তারা দেখেছে, তাও জানে না। এক গাদা জোনাকি যখন সুনন্দার গায়ের উপর পড়ে হুটোপুটি শুরু করে, তখন সেই আনমনা আবেশ হঠাৎ চমকে উঠে ভেঙে যায়। বুঝতে পারে সুনন্দা, বাবা খেতে বসেছেন ; আর মার সঙ্গে গল্প করছেন।

শুনতে একটুও ভাল লাগে না যে গল্প, সেই গল্পই শুরু করেছেন বাবা। পুষ্কর দত্তের যত কীর্তির আর বাহাদুরীর গল্প।—বেশ জেদ আছে ছেলেটার ; চেষ্টাও আছে, তেমনি খাটতেও পারে। এ ছেলে একদিন উন্নতি করবে।

জোরে একটা ঢেঁকুর তুলেছেন বিজনবিহারী। বুঝতে পারে

সুনন্দা, বাবার খাওয়া শেষ হল। কিন্তু, কি আশ্চর্য, গল্প শেষ করছেন না বাবা।

বিজনবিহারী বলেন, গত বছর কালী পূজোর সময় চমৎকার একটা কাণ্ড করে বসেছিল পুষ্কর। কোন মুণ্ডা গাঁয়ের একটাও মানুষ যেন কালীপূজো দেখতে না আসে, সে-জন্যে মিশনের ছোট ফাদার ভয়ানক জবর একটা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুষ্কর নিজে গিয়ে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে পাঁচশ মুণ্ডা ছেলে-মেয়ের একটা মিছিল নিয়ে এসে কালীবাড়ির আঙিনায় হাজির করেছিল। পুষ্করের ওপর মারধরেরও একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ঘাবড়ায় নি পুষ্কর।

এই পুষ্করী রামায়ণ এখন থামলে হয়। সুনন্দার চোখে একটা অস্বস্তির ভ্রূকুটি ছটফটিয়ে ওঠে। বারান্দায় গিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে; তাহলে এই গল্পের কোন শব্দ আর কানের কাছে পৌঁছতে পারবে না।

কি আশ্চর্য, মা'ও যে হেসে হেসে একটা অদ্ভুত কথা বলছেন—পুষ্করের স্বভাবটা দেখছি প্রায় তোমারই মত।

আর শুনতে ইচ্ছে করে না। নিরুপমার মৃদু হাসির শব্দটাও যেন মাইনর স্কুলের থার্ড টিচারের প্রশস্তির গুঞ্জন। বাবা আর মা দুজনের কেউই একটু বুঝে দেখছেন না যে, আজ এভাবে পুষ্কর দত্তের নামে এত গৌরবের কথা বললে যে ওদিকের একটা মানুষকে অপমান করা হয়। ভয় করে সুনন্দার, বারান্দায় গিয়ে বসে থাকলেও কোন লাভ হবে না। হয়তো শিউলিগুলোও পুষ্করের নামে জয়ধ্বনি করে সুনন্দার অস্বস্তির জ্বালাটাকে আরও দুঃসহ করে দেবে।

॥ আঠার ॥

কমলসাগরের নতুন ঘাটের কাছে হলদে করবীর ছায়ার পাশে দাঁড়িয়ে মোহিতের সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে যেন একটা অস্বস্তির হাত এসে সুনন্দার মুখ চেপে ধরে আর ভাষা ভুল করিয়ে দেয়। না, এখানে আর নয়। জল নেবার জন্য যেখানে মানুষের ভিড়ের আনাগোনা লেগেই আছে, সেখানে ভালবাসার মন মুখ খুলে কথা বলতে বাধা পায়, বলতে পারে না।

কিন্তু আশ্চর্য, এই দু'মাসের মধ্যে কতবার কমলসাগরের ঘাটের এই হলদে করবীর কাছে দাঁড়িয়ে মোহিতের সঙ্গে গল্প করেছে সুনন্দা, কিন্তু কই, এরকম একটা অস্বস্তির কাঁটা তো সুনন্দার মনে বেঁধে নি ? ভাবতে একটা রহস্য বলেই মনে হয়। কিসের অস্বস্তি, কোথা থেকে আসছে ?

ঘাটের পথে যারা আনাগোনা করে, তারাও কি কিছু জানে না ? আর দেখেও কি কিছু বুঝতে পারে না ? হতেই পারে না ! আজ শিউলিবাড়ির কে না জানে যে, মাটিসাহেবের মেয়ের সঙ্গে মোহিত অডিটারের ভাব হয়েছে ? খবরটা যে শিউলিবাড়ির সব আলোছায়াকে খুশির হাসিতে মুখর করে দেবার মত খবর। কিন্তু শিউলিবাড়ি যেন প্রচণ্ড একটা ধৈর্য ধরে খুশির হাসি চেপে রেখেছে। ঘাটের পথের লোকজন শুধু একবার তাকিয়ে দেখে আর চলে যায় ; হলদে করবীর ছায়ার কাছে যেন কোন ঘটনাই নেই। খবরটা শুনে যার আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবার কথা, সেই চাচিজী বিন্ধ্যাচলীও তো খবরটা জেনেছে। কিন্তু কই, চাচাজী তো একদিনও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল না ? নন্দুয়া বেটির গলা জড়িয়ে ধরে গান গেয়ে উঠল না। সন্দেহ হয় ; মাটিসাহেবের মেয়ের সৌভাগ্যের খবর শুনে খুশি না হয়ে, বরং যেন একটা হিংসের জ্বালা চাপা দেবার জন্য গম্ভীর হয়ে রয়েছে শিউলিবাড়ি।

সুনন্দা হাসে ঃ চল, এখানে আর ভাল লাগে না।

—কেন ?

—মনে হচ্ছে আমদের দু'জনকে দেখতে ওদেরও ভাল লাগছে না।

মোহিতও হাসে ঃ তাতে আমাদের কোন্ স্বর্গের বাতি নিবে যাবে ?

—তা তো বটে, কিন্তু বুঝতে পারছি না।

—কি ?

—আমাকে কেউ হিংসে করছে, না তোমার ওপর কেউ রাগ করছে ?

—তোমাকে হিংসে করবার একটা মানে হয় ; কিন্তু আমার ওপর রাগ করবার তো কোন মানে হয় না।

—কেন ?

—আমি কি তোমাদের শিউলিবাড়ির কারও চেয়ে ছোট ?

—ছিঃ, তুমি আবার কেন রাগ করে কথা বলছ ? কে না জানে যে, বাবা তো নিজের মুখে তিনবার বলেছেন, তুমি হলে শিউলি-বাড়ির গর্ব।

—আমার কি মনে হয় জান ? সবাই একটু বেশি আশ্চর্য হয়েছে , যাকে বলে, একটু হতভম্ব হয়ে গেছে।

—তাই তো মনে হয়।

মোহিতের চোখ জ্বলজ্বল করে হাসে ঃ কিন্তু তুমি কি বল, সেটা তো জানতে পেলাম না।

সুনন্দার চোখ দুটো যেন একটা কৃতজ্ঞ মায়ার ভার সামলাতে না পেরে ছলছল করে।—আমাকে আর কেন মিছে জিজ্ঞাসা করছ ? কলকাতার মেয়ের মত লেখাপড়া জানলে হয়তো বলে দিতে পারতাম; কিন্তু বলতে জানি না বলেই বলতে পারছি না। তুমিও জান না, আমাকে ভালবেসে তুমি আমাকে কত বড় মান দিয়েছ !

হেঁটে হেঁটে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে সুনন্দা আর মোহিত।

এখান থেকে কমলসাগরের ঘাটের কাছের হলদে করবীটা দেখা যায় না, স্টেশন রোডের কোন দোকানের কলরবও শোনা যায় না। দু'-পাশে শাল সেগুন আর দেওদারের বীথিকা, মাঝখানে ছায়াভরা রাঁচি রোড এঁকে বেঁকে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ঘুরে-ফিরে উধাও হয়ে গিয়েছে। যেন নিরিবিলি জগতের একটা ছায়াপথ পড়ে আছে এখানে। ভালবাসার দুটো হাত যদি এখানে, এই বিকেলের আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তবু উঁকি দিয়ে দেখবার মতও কোন বাধা এখানে নেই। সুনন্দাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মোহিত।

সুনন্দা হাসে: তবু কিন্তু বুঝতে পারছি না, তুমি কেমন করে আমাকে এত ভালবাসতে পারলে?

—এক কথায় বলে দিতে পারি।

—বল।

—তুমি শিউলিবাড়ির সেরা মেয়ে।

—শিউলিবাড়ির সেরা মেয়ে আমি নই; কিন্তু তোমার তাই মনে হয়েছে।

—হ্যাঁ। একই কথা হল। এবার তুমি বল তো, শুনি।

—কি?

—আমাকে তুমি ভালবাসলে কেন?

—এক কথায় বলে দিতে পারি।

—বল।

—আমারও মনে হয়েছে।

—কি মনে হয়েছে?

সুনন্দার চোখ-মুখ ছাপিয়ে যেন একটা সুস্মিত অনুভবের আনন্দ উতলা হয়ে ঝরে পড়তে থাকে। তুমি বাংলা দেশের সেরা ছেলে।

॥ উনিশ ॥

ভাবতে পারে নি সুনন্দা, সেই অস্বস্তিটা শুধু একবার এসে আর রামপ্রসাদী গানের পাঁচটা রেকর্ড বাবাকে উপহার দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে যাবে, আর কখনও আসবে না। বরং দুটো দিন ধরে সন্দেহময় একটা আতঙ্কে ভুগতে হয়েছিল। রামপ্রসাদী গানের রেকর্ড একটা চমৎকার ছুতো; সেই ছুতো ধরে এবার থেকে হয়তো রোজই আসবে পুষ্কর দত্ত। হয়তো শিউলির ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে; হয়তো মাটিসাহেবের মেয়ের মুখ দেখবার জন্যে পিপাসিতের মত জানলাটার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

কিন্তু আসে নি পুষ্কর। সুনন্দার উদ্বিগ্ন মনটা যেন একটা হাঁপ ছেড়ে হালকা হয়ে গিয়েছে। আতঙ্কের কথাটা মনে পড়তেই মনটা যেন একটা লজ্জাও পেয়েছে। আকাশে মেঘ নেই, তবু বজ্রপাতের ভয়ে ভীরু হয়ে গিয়েছিল সুনন্দার প্রাণ। এত বড় অস্বস্তিটা যে সত্যি একটা চমৎকার ঠাট্টা।

কিন্তু কি আশ্চর্য, স্বস্তিটাও যেন একটা চমৎকার শূন্যতা। চমকে ওঠে সুনন্দা। ভাবনাটার বেহায়াপনা দেখে নিজেরই উপর রাগ করে ছটফটিয়ে ওঠে সুনন্দার একটা নিশ্বাসের বাতাস। কুৎসিত ভাবনাটা যেন মোহিতের ভালবাসাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠকাচ্ছে; চোর যেমন লুকিয়ে লুকিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত মানুষের মাথার কাছ থেকে সিন্দুকের চাবি নিয়ে সরে যায়।

—মা শুনছ? হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাক দিতে গিয়েই গলার স্বরের আক্রোশটাকে সামলে নিয়ে একটা লজ্জাতুর ব্যাকুলতার গুঞ্জনের মত মৃদুস্বরে ডাক দেয় সুনন্দা।

নিরুপমা সাড়া দেন, কি হল?

—কই, তোমরা যে কিছু বলছ না।

—কি ?

—মোহিতবাবুকে কি তোমরা কেউ কিছু বলবে না ?

নিরুপমা হাসেন ; সুনন্দার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, নিশ্চয় বলা হবে। তোর বাবার ইচ্ছে, বিয়েটা এই অঘ্রাণেই চুকে যাক।

বাইরের বারান্দাতে একটা চেয়ার যেন ব্যস্তভাবে শব্দ করে ছটফটিয়ে উঠল। তার পরেই চেঁচিয়ে ওঠে একটা উচ্ছল খুশির কণ্ঠস্বর।—হ্যাঁ, অঘ্রাণ মাসই সবচেয়ে ভাল মাস, নিরু। নলেন গুড় না পাওয়া যাক, খেজুরের নতুন রস তো পাওয়া যাবে। কোন অসুবিধে হবে না।

হেসে হেসে চলে যাচ্ছিলেন নিরুপমা। সুনন্দা বাধা দেয়—তুমি আজ আবার রান্নাঘরে ঢুকছ কেন ? তোমার না কাশি বেড়েছে ?

—তাতে কি হয়েছে ?

—না, তুমি চুপটি করে বসে থাক।

—তুই রাঁধবি ?

—হ্যাঁ।

—না ; আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে ; মেয়ে আমার হাঁড়ি ঠেলতে চাইছেন। তা হবে না।

চেঁচিয়ে উঠলেন বিজনবিহারী : কখখনো না, নিরু। নন্দুকে এখন আর ওসব পাগলামি করতে দিয়ো না। উনুনের আঁচ ভয়ানক বিশ্রী জিনিস, মুখের রঙ একেবারে কালচে করে দেয়।

বাইরের বারান্দাতে যেন একটা কলরবের ঝড় উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। এক গাদা ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ের কলরব। কলরবের ভাষাটা যেন একটা অভিযোগের ভাষা ; কিংবা এক গাদা অভিমানের কাকলী।

চমকে ওঠে সুনন্দা। কলরবের মধ্যে সেই দুঃসহ অস্বস্তির নামটাই বার বার বেজে উঠছে—পুষ্করদা ! পুষ্করদা !

কি হয়েছে? কারা এসেছে? ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় সুনন্দা। দেখতে পায়, যারা এসেছে, তারা বয়সে ও চেহারায় শিউলিবাড়ির ভোরের পাখির মত একগাদা কলরবের প্রাণ। সাত-আট-নয়-দশ বছরের বেশি বয়স কারও নয়; নতুন বস্তির, স্টেশন রোডের, আর কালীতলার যত ছেলে আর মেয়ে। চক্রবর্তী ঠাকুরের ছোট মেয়ে জয়ন্তী আছে, হেডমাস্টার দীনবন্ধু বাবুর মেয়ে মনোরমাও আছে। এমন কি লালাদের বাড়ির তিন-চারটে মেয়েও আছে।

শিউলিবাড়ি ক্লাবের প্রেসিডেণ্টের কাছে একটা অভিযোগ নিয়ে এসেছে ওরা।

জয়ন্তী বলে, মোহিতবাবু বললেন, ক্লাবে আমাদের থিয়েটার করা চলবে না।

—কিসের থিয়েটার?

মনোরমা বলে, পুষ্করদা আমাদের জন্যে একটা নাটক লিখে দিয়েছেন।

—অ্যাঁ? চমকে উঠেই হেসে ফেলেন বিজনবিহারী।—ভালই তো।

—কিচ্ছু ভাল হল না। মোহিতবাবু বারণ করে দিয়েছেন।

—বুঝলাম না।

এবার পূজোতে আমরা ক্লাব-বাড়িতে থিয়েটার করব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু মোহিতবাবু বললেন, না, হবে না।

—হবে হবে। কেন হবে না? নিশ্চয় হবে। তোমরা এখন বাড়ি যাও জয়ন্তী, আমি সব ঠিক করে দেব।

বিষণ্ন অভিযোগের কলরব সেই মুহূর্তে খুশির কলরব হয়ে ছুটে চলে গেল। আর, ঘরের ভিতরে ঢুকে, জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে এইবার সুনন্দাও বুঝতে পারে; সুনন্দার সৌভাগ্যের সব কলরব স্তব্ধ করে দেবার জন্য একটা চক্রান্ত জেগে উঠেছে, তার নাম পুষ্কর দত্ত। রমাসুন্দরী মাইনর স্কুলের থার্ড টিচারের ফুসফুসে বেশ তো

সাহস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মোহিতের বিদ্যাবুদ্ধির উপর হিংসে করে একটা নাটকই লিখে ফেলেছে। ভুল করেছে, ভয়ানক ভুল করেছে পুষ্কর দত্ত। আঁকশি দিয়ে খুঁচিয়ে আকাশের চাঁদকে মাটির ধুলোতে নামিয়ে দেবে, এটা পাগলের কল্পনার আশা।

চক্রান্তের চেষ্টাটার রকম দেখে হেসে ফেলতেও ইচ্ছে করে। বোকা ছেলের লোভ যেমন নাগালের বাইরে একটা গাছের ফল ধরবার জন্য ভাঙা নড়বড়ে পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে আর হাত বাড়িয়ে আঁকুপাকু করে, এ-যেন তেমনিই একটা করুণ লোভের চেষ্টা। এ চেষ্টাকে হেসে তুচ্ছ করাই উচিত।

সত্যিই, মুখটাকে হঠাৎ হাসিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতরে এই বদ্ধতার ভেতর থেকে হঠাৎ ব্যস্তভাবে বের হয়ে যায় সুনন্দা। কালীতলা পার হয়ে ছোট নদীর কিনারায় এসে বটের ছায়ার কাছে একলা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে। নুড়ি আর বালুর উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা রোগাটে স্রোত ; স্রোতের জলের সঙ্গে একটা একলা জবা ফুল তরতর করে ভেসে চলে যাচ্ছে। সুনন্দারও প্রাণটা যেন একটা একলা স্বপ্নের মত কোন নিরিবিলি ঘুমের জগতে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে চাইছে। আর ভাবতে ভাল লাগে না। সব ভাবনার উৎপাত থেকে ছাড়া পেতে চায় সুনন্দার ক্লান্ত প্রাণ। সুনন্দার মুখের এই হাসিটাও যেন হাঁপিয়ে পড়া একটা ক্লান্তির করুণ হাসি।

বাড়িতে ফিরে এসেই কিন্তু চমকে উঠতে হয়। সুনন্দার এই ক্লান্ত হাসির মুখটাও বিরক্ত হয়ে কেঁপে ওঠে। বুকের ভিতরে সেই অস্বস্তিটা আবার চিৎকার করে উঠতে চায়। কারণ, বিজনবিহারীর একটা উৎফুল্ল হাসির শব্দ যেন চিৎকার করে উঠল : পুষ্কর এসেছিল।

—কেন ?

—পুষ্কর খুব লজ্জিত।

—কেন ?

—ক্লাব বাড়িতে থিয়েটার করবার জন্য পুষ্কর কাউকে পরামর্শ দেয় নি। জয়ন্তী আর মনোরমা, দুষ্টু দুটো নিজেরাই মতলব করে মোহিতকে গিয়ে ধরেছিল।

—কিন্তু নাটকটা তো পুষ্করবাবু লিখে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ, সেজন্যে পুষ্কর বেচারা আরও লজ্জিত।

—কেন?

—পুষ্করের লেখা নাটক পড়ে মোহিত হেসেছে।

—তা, হাসবার মত ব্যাপার হলে মানুষ না হেসে পারবে কেন?

—হ্যাঁ, পুষ্করও সেটা বোঝে, সেজন্যেই জয়ন্তীকে বার বার বলে দিয়েছিল পুষ্কর, ওরা যেন পুষ্করের লেখা নাটক-ফাটক নিয়ে গিয়ে মোহিতকে বিরক্ত না করে।...এ কি? তোর চোখ-মুখ এ রকম ছলছল করছে কেন? খুব ঠাণ্ডা লাগিয়েছিস বুঝি?

—হ্যাঁ।

—গরম জলে চান করবি।

নিরুপমা তাঁর রান্নার ব্যস্ততা ছেড়ে দিয়ে ব্যস্তভাবে ছুটে আসেন। সুনন্দার কপালে হাত রাখেন, ঠিকই তো, মেয়ের কপাল যে ছম্‌ছম্‌ করছে। জ্বর বলেই তো মনে হচ্ছে।

বিজনবিহারী বলেন, ঠিক আছে; আমি তো এখনই বের হব, যাবার পথে সেনবাবুকে একটা খবর দিয়ে যাব, যেন এখনই এসে একবার দেখে যান।

ঠাণ্ডা লেগেছে ঠিকই, আর জ্বরও হয়েছে নিশ্চয়; কিন্তু শুধু সেই জন্যেই কি সুনন্দার চোখ-মুখ ছলছল করছে? গায়ে চাদর জড়িয়ে বিছানার উপর নিঝুম হয়ে পড়ে থাকলেও, প্রশ্নটা যেন ধূর্ত একটা ঠাট্টার মত সুনন্দার কানের কাছে ফিসফিস করছে। ছি ছি, পুষ্কর দত্তের চক্রান্তটা যে সুনন্দার একটা মিথ্যে রাগের মিথ্যে কল্পনা। পুষ্কর দত্ত যে নিছক একটা চেষ্টাহীন নিরীহতা। একটা অলস অসার ছায়া মাত্র। মাটিসাহেবের মেয়ের সৌভাগ্যের পথে কাঁটা পেতে রাখবার কোন গরজ ওর নেই।

মাটিসাহেবের মেয়ের মুখের দিকে তাকাবার কোন গরজও কি কোনদিন ওর চোখে দেখা দিয়েছিল? কোনদিনও না। বছরের বারো মাসের মধ্যে অন্তত বারো বার মাটিসাহেবের মেয়ের সঙ্গে থার্ড টিচার পুষ্কর দত্তের মুখোমুখি দেখা হয়েছে। কিন্তু সুনন্দার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাকুক, সুনন্দার মুখটাকে একটু ভাল করে দেখবার জন্যও তার চোখে কোন লোভের চেষ্টা ব্যস্ত হয়ে ওঠে নি। সেদিনও রুদ্রকিশোর শীল্ড বুকে জড়িয়ে ধরে যখন মিছিলের আগে আগে হেঁটে চলে গিয়েছে ক্যাপ্টেন পুষ্কর দত্ত, তখনও তো দেখতে পায় নি সুনন্দা, সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কোন ছবির মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করেছে পুষ্কর দত্ত। এমন মানুষকে সন্দেহ করাও যে চোরের রাগের মত একটা বেহায়াপনা। রাগ করে নিজের মনটাকেই ঘেন্না করতে ইচ্ছে করে। আর জোর করে এই ঘেন্নাটাকেও ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। বিছানা ছেড়ে ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুনন্দা। গরম জল হয়ে গিয়ে থাকলে এখনই স্নান করে নিতে হবে।

সেনবাবু এসে বললেন, না না, কিচ্ছু ভাববার নেই; সামান্য সর্দি-জ্বর।

দশটা বড়ি দিয়ে চলে গেলেন সেনবাবু। কিন্তু দশটা দিন পার হয়ে গেলেও, আর সুনন্দার চোখ-মুখের ছলছলে ভাব কেটে গিয়ে বেশ খোলা-মেলা একটা খুশির ভাব হেসে উঠলেও, সর্দি-জ্বরের ভাবটা যেন সুনন্দার গা থেকে ছেড়ে যেতে চায় না।

এই দশদিনের মধ্যে তিনবার এসেছে মোহিত। চাদর গায়ে জড়িয়ে আর বাইরের বারান্দাতে দাঁড়িয়ে মোহিতের সঙ্গে কথা বলেছে সুনন্দা। মোহিতকে চা এনে দিতেও ভুলে যায় নি সুনন্দা। আর মোহিতের দু'চোখের ব্যাকুলতাও যেন বিস্মিত হয়ে বার বার সুনন্দার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছে। কি আশ্চর্য সুনন্দা! জ্বরটা যে তোমাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

সুনন্দা হাসে: তাহলে জ্বরটা আরও দশটা দিন থাকুক, আরও সুন্দর হয়ে উঠি।

—না, তা নয়; তোমাকে দেখতে সত্যিই অদ্ভুত লাগছে, একেবারে নতুন মুখ বলেও মনে হচ্ছে; তাই মনের কথাটা বলেই দিলাম।

সুনন্দার মুখটা হঠাৎ বড় বেশি গম্ভীর হয়ে যায়। যেন একটা দুরন্ত নিশ্বাসের আবেগ চেপে চেপে কথা বলে সুনন্দা—বাবার কাছে তুমি এখনও কথাটা বলছ না কেন?

সুনন্দার কথাটার মধ্যে যেন একটা অধীরতার ঝাঁজ লুকিয়ে আছে। বোধ হয় সেটা মোহিতের কানেও ঠেকেছে। তাই বোধ হয় মোহিতের মুখটা একটু করুণ হয়ে যায়।—তুমি যেদিন বলতে বলবে, সেদিনই বলে দেব।

—তাহলে আজই বল।

—বেশ।

চুলগুলি রুক্ষ হয়ে ফেঁপে উঠেছে। চোখ দুটো বেশ চকচকে হয়েছে। কাজল পরে নি, তবু চোখের কোল জুড়ে একটা কাজলা ছায়ার কালিমা, মুখটা একটু বেশি ভরাট, চোখের চাহনিটা ভার ভার; আর ঠোঁট দুটো বড় বেশি লালচে। আজ আয়নার দিকে তাকাতে গিয়ে সুনন্দার নিজেরই চোখে মুখটাকে খুবই নতুন নতুন ঠেকেছে। আর, ছোট্ট একটা বিস্ময়ের নিশ্বাসও বুকের ভিতরে ঠেকেছে। না, জ্বরের জন্য নয়; কোন সন্দেহ নেই, শরীরটারই একটা রহস্যের ভয়ে সুনন্দার মুখটা ভীরু হয়েছে বলেই এরকম সুন্দর দেখাচ্ছে।

মোহিত যখন চলে যায়, তখন দূরের সিংহানী পাহাড়ের গায়ে ক্লান্ত বিকালের রোদ লালচে হয়ে গলে পড়েছে। জ্বরের শরীর চাদরে জড়িয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছে সুনন্দা, সেটা সুনন্দার চোখও যেন বুঝতে পারছে না।

—কি ভাবছ নন্দু বহিন? যেন কলকলিয়ে হেসে কথা বলছে একটা খুশির ঝর্না।

চমকে ওঠে সুনন্দা: তুমি কবে এলে রাজুদি?

রাজমোহিনী হাসে : আজ এসেছি। কিন্তু এ কি শুনছি নন্দু? ঠিক তো?

—ঠিক।

রাজমোহিনী আরও খুশি হয়ে হাসে।—কিন্তু এরই মধ্যে মুখটা এত সুন্দর করে ফেললে কেমন করে? দেখলে যে মহাদেবও পাগল হয়ে যাবে।

—কি বললে?

রাজমোহিনী ফিসফিস করে হাসে : বলছি, বিয়ের আগে তো মুখ এমন সুন্দর হয় না, বিয়ের পরে হয়।

চমকে ওঠে সুনন্দা : কি বললে?

—বলছি ; বরের কথা ভেবেই যদি এত রূপ খুলে যায়, তবে বরের গা ছোঁয়ার পর কী রূপই না খুলবে।

সুনন্দার চোখ দুটো যেন স্তব্ধ হয়ে রাজমোহিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু রাজমোহিনীর খুশির মুখরতা থামতে চায় না : রাগ করিস না নন্দু বহিন। সত্যি তোকে কোনদিন দেখতে এত সুন্দর লাগে নি।

চলে যায় রাজমোহিনী। বিকালের আলো সরে গিয়ে চোখের সামনে যে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে উঠছে, সেটাও বোধ হয় সুনন্দার চোখে পড়ছে না।

নিরুপমা ডাকলেন, ভেতরে আয় নন্দু।

॥ কুড়ি ॥

ঘরের ভিতরে গিয়ে আলোর সামনে একটা মোড়ার উপর বসে থেকেও যেন আলোটাকে দেখতে পাচ্ছে না সুনন্দার উদাস দুটো কালো চোখ। নিরুপমা তিনবার এসে তিনবার কপালে হাত বুলিয়ে চলে গেলেন। সেই তিনটে স্নিগ্ধ ছোঁয়ার স্বাদও বোধ হয় অনুভব করতে পারে নি সুনন্দার তপ্ত কপালটা। কিন্তু কান দুটো হঠাৎ চমকে উঠেছে। বাইরের বারান্দায় কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন বিজনবিহারী, আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে হেসে উঠছেন।

বুঝতে আর ভুল হবে কেন? পুষ্কর দত্ত এসেছে। পুষ্কর দত্ত তার একলা জীবনের যত শখ সাহস আর চেষ্টার গল্প বলছে। এসব গল্পের সঙ্গে সুনন্দার অদৃষ্টের কোন সম্পর্ক নেই। এসব গল্প শোনবার জন্য সুনন্দার মনে এক ছিটে কৌতূহলও নেই। সেদিন রামপ্রসাদী গানের রেকর্ড এনেছিল; আজ হয়তো মীরাবাঈয়ের গানের রেকর্ড নিয়ে এসেছে। স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্টকে খুশি করছে স্কুলের থার্ড টিচার। মুরুব্বীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ঘুস দিয়ে খুশি করছে একটা উন্নতির মতলব। মাটিসাহেবের মেয়ের জীবনের আনন্দকে বিরক্ত করবার কোন মতলব নয়।

বাইরে বারান্দাটা যখন নীরব হয়ে যায়, তারপর বোধ হয় একটা মিনিটও পার হয় না, ঘরের ভিতরে ঢুকে খুশির স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন বিজনবিহারী: একটা সুখবর আছে, নিরু।

—বল।

—পুষ্কর ঠিক আমার মতই একটা কাণ্ড করেছে।

—কিসের কাণ্ড?

—বর্ধমান থেকে এক বন্ধু ডাক্তারকে আনিয়ে শিউলিবাড়িতে বসিয়েছে পুষ্কর।

—ডাক্তার ?

—হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। নতুন বস্তিতে ঘরভাড়া নিয়ে ওষুধের একটা দোকানও করে ফেলেছে রাজীব ডাক্তার। পুষ্কর খুব সাহায্য করেছে। আজ, এই সন্ধ্যাতে রাজীব ডাক্তারের ওষুধের দোকান-প্রতিষ্ঠার পূজো হয়ে গেল।

—ভাল হল। রাজীব ডাক্তারের উন্নতি হক।

—আরও ভাল কথা, পুষ্কর দুটো ওষুধ দিয়ে গেল। একটা ওষুধ সকালবেলার জন্যে, একটা সন্ধ্যাবেলার জন্যে।

—কিসের জন্যে ?

—সুনন্দার জন্যে। রাজীব ডাক্তার বলেছে, দুদিনের মধ্যে সর্দি-জ্বর ভাল করে দেবে এই ওষুধ।

বিজনবিহারীর হাতে সত্যিই দুটো শিশি। আলো পড়ে ছোট্ট কাচের শিশি দুটোও যেন ঝিকঝিকিয়ে হাসছে। কিন্তু সুনন্দার আতঙ্কিত চোখ দুটো শুধু কেঁপে কেঁপে দুটো নির্মম বিদ্রূপের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুকের ভিতরে অস্বস্তির জ্বালাটা বোধ হয় আগুনের শিখা হয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। না, অসম্ভব। পুষ্কর দত্তের চোরা উপকারের এই ওষুধ মুখে দিতে পারবে না সুনন্দা ; ওষুধের শিশি দুটোকে এই মুহূর্তে জানলার বাইরে ওই শক্ত অন্ধকারের গায়ে ছুঁড়ে আছাড় দিয়ে গুঁড়ো করে দিতে হবে।

সুনন্দার মুখের প্রশ্নটাও যেন যন্ত্রণাক্তের মত ছটফটিয়ে ওঠে।—তুমি কি পুষ্করবাবুকে ওষুধ দিয়ে যাবার জন্য বলেছিলে ?

—না, আমি তো কিছু বলি নি। আমি বলবই বা কেন ?

দেওয়ালের তাকের উপরে ওষুধের শিশি দুটোকে রেখে দিয়ে চলে যান বিজনবিহারী। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমাও চলে যান। আর, সুনন্দার হঠাৎ-ক্ষুব্ধ আত্মাটা যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে শান্ত হয়ে যায়। একটা মিথ্যে ভয়ের সঙ্গে কোন্দল করবার লজ্জা। মাথাটা যেন নিজের ইচ্ছায় হেঁট হয়ে যেতে চাইছে। দু'হাত তুলে কপালটাকে

ঠেকিয়ে রেখে এই অলস মাথাটার সব ভার ধরে রাখতে চেষ্টা করে সুনন্দা।

কোন সন্দেহ নেই, আবার ভাবতে ভুল করেছে সুনন্দার মন। পুষ্কর দত্তের প্রাণ আড়াল থেকে কারও মুখের ছবিকে ধ্যান করছে না। চেষ্টা করে নয়, খোঁজ করে নয়, উঁকি-ঝুঁকি দিয়েও নয়, ভদ্রলোক বোধ হয় হঠাৎ জয়ন্তী কিংবা মনোরমার মুখের কথা থেকে জানতে পেরে গিয়েছে, সুনন্দাদির জ্বর হয়েছে। তাই ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে।

ফুলনবাবুর ছেলের বউ পার্বতীর মুখ থেকেই একদিন গল্পটা শুনেছিল সুনন্দা। যেদিন সিলুয়াডি কোলিয়ারি টিমকে হারিয়ে দিয়ে রুদ্রকিশোর হকি শীল্ড পেল শিউলিবাড়ি ইলেভেন; সেদিন পার্বতীর শ্বশুর ফুলনবাবু আহ্লাদে আটখানা হয়ে শিউলিবাড়ি ইলেভেনের ক্যাপ্টেন পুষ্করবাবুকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন —জওয়ান-ই-বঙ্গাল! জিতা রহো পুষ্কর!

সর্দার সুচেত সিং পুষ্করের হাত ধরে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেনঃ কৈসর-ই-শিউলিবাড়ি। খুশ রহো পুষ্কর।

আজ আবার এ ছাই গল্পটাকে বার বার মনে পড়ে কেন? মনে পড়িয়ে লাভই বা কি? গল্পটা যে আসতে অনেক দেরি করেছে। যদি আর একটা বছর আগে গল্পটা আসতে পারত, তবে বোধ হয়...।

আবার ভাবতে ভুল করছে সুনন্দা। একটা বছর আগে পুষ্করের মুখের দিকে তাকালেই বা কি লাভ হত? কিছু না; সুনন্দার কপালের উপর কোন ফুলের পরাগ ঝরে পড়ত না। পুষ্কর দত্ত তো কোন আশা নিয়ে মাটিসাহেবের মেয়ের মুখের দিকে তাকাত না!

বুঝতে আর কোন অসুবিধাও নেই। বাংলা দেশের জোয়ান হয়ে আর শিউলিবাড়ির কৈসর হয়ে মানুষের উপকারের কাজে খেটে বেড়ায় যে মানুষটা, সেই মানুষটা মাটিসাহেবের মেয়ের সর্দি-জ্বরের

ওষুধ এনে দিয়েছে। এই মাত্র। এ ওষুধের মধ্যে অদৃশ্য কোন শর্ত নেই, গোপন কোন দাবিও নেই। এর মধ্যে রাগ করবারই বা কি আছে? আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? পুষ্কর দত্ত যদি আবার আসে, তবে বরং খুশি হয়ে আর হেসে হেসে বলে দেওয়াই উচিত, খুব ধন্যবাদ পুষ্করবাবু, খুব উপকার করলেন, আপনার ওষুধ খেয়েছি, জ্বরও সেরে গেছে।

জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে সুনন্দা, মুখটাও হাসতে শুরু করে দেয়। আর চোখ দুটোও যেন নিরাতঙ্ক স্বস্তির সুখে সিক্ত হয়ে হাসতে থাকে।

—বাঃ, এতো বেশ মজার চোখ! সুনন্দার ঠোঁটের ফাঁকে স্বস্তির হাসিটাও হঠাৎ বিড়-বিড় করে ওঠে। হাত তুলে চোখ দুটোকে ব্যস্তভাবে মুছে দিয়েই দেওয়ালের তাকের কাছে এগিয়ে যায় সুনন্দা। সন্ধ্যাবেলায় খেতে হবে কোন্ ওষুধটা?

ওষুধের শিশির গায়ে কথাটা লেখাই আছে। ওষুধ খায় সুনন্দা।

চমকে ওঠে সুনন্দা। কি যেন ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে, আজকের মনটা কি-ভয়ানক ভুল করে এই কিছুক্ষণ আগে কত রূঢ় ভাষায় মোহিতের সঙ্গে কথা বলেছে। বুঝতেও পারে, মনের ভিতরে একটা লজ্জার বেদনা করুণ হয়ে হাসছে। ছি ছি, ভাগ্যের সব চেয়ে সুন্দর ইচ্ছার ভাষাটা কি অদ্ভুত গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল! কোথা থেকে একটা মূর্খ সন্দেহ এসে মোহিতের নিশ্চিন্ত ভালবাসার মনটাকে যেন ধমক দিয়ে কথা বলতে চেয়েছিল।

জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা। এ সন্ধ্যা তো কোন অমাতিথির সন্ধ্যা নয়। চাঁদ ওঠবার কথা। কিন্তু আর কত দেরি? কুয়াশার উপর চাঁদের হাসি লুটিয়ে পড়বে কখন? মোহিত আসবে কখন? বাবার কাছে কথাটা বলবেই বা কখন?

সুনন্দার ভাগ্যের এই উৎফুল্ল কৌতূহলের সব ব্যস্ততাকে যেন হঠাৎ শান্ত করে দেবার জন্য ভিতরের আঙিনায় একটা শাঁখ বেজে

উঠল ; সেই সঙ্গে একটা কলরবের উৎসব। এগিয়ে গিয়ে দেখতে পায় সুনন্দা, মনোরমা আর জয়ন্তী কাড়াকাড়ি করে শাঁখ বাজাচ্ছে। দেখতে পায়, বাইরের বারান্দায় চক্রবর্তী ঠাকুর পাঁজি হাতে নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন।

এগিয়ে আসেন নিরুপমা। দু'হাতে মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেন। —মোহিত নিজেই বিয়ের কথা বলেছে। তার দিন ঠিক করছেন চক্রবর্তী ঠাকুর।

কিন্তু আজ হঠাৎ এমন একটা বিষন্ন আর চিন্তিত চেহারা নিয়ে কেন বাড়ি ফিরলেন বিজনবিহারী, শিউলিবাড়ির এই মাটিসাহেব, যাঁর দুই চোখে এই পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একটা প্রসন্ন দুঃসাহসের সূর্য শুধু জ্বলজ্বল করে হেসেছে? আজকের অগ্রাণের সন্ধ্যায় কুয়াশার মধ্যেই বা কোন্ বিভীষিকার ছায়া দেখলেন, যে-জন্যে মাটিসাহেবের মত শক্ত-পোক্ত মানুষের হাতপায়ের জোর শিথিল হয়ে যেতে পারে? বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েও সাইকেলের ঘন্টি বাজাতে পারলেন না কেন? গলার জোরই বা কেন এত অলস হয়ে গেল, যে-জন্যে একটা ডাকও দিতে পারলেন না: আমি এসেছি নিরু? কিংবা—আমি এসেছি নন্দু!

বেশ তো হেসে-হেসে, আর যেন একটা বিপুল আহ্লাদের ঝড়ের মত শিউলিবাড়ির চারিদিকে সাইকেল ছুটিয়ে ঘুরছিলেন বিজনবিহারী। খোঁজ করে জেনেছেন, ঝুমরাগড়ের শুক্রবারের হাটে সরু চাল ওঠে; কুমার সাহেব বলেছেন, হাতিটাকে দু'দিনের জন্য দিতে পারবেন। সিলুয়াড়ি কোলিয়ারীর ওভারম্যান মজুমদার বলেছেন, আদ্রা থেকে চারজন ভাল জেলে আনিয়ে দিতে পারবেন; বড় ঝিলের সব কালবোশ ছেঁকে তুলতে পারা যাবে। পুষ্কর তো রাজি হয়েই আছে, বিয়ের দু'দিন আগে রাঁচিতে গিয়ে ব্যাণ্ডপার্টি সঙ্গে নিয়ে চলে আসবে। সুনন্দার বিয়ের উৎসবটাকে হর্ষে উল্লাসে ভরে দেবার কল্পনা নিয়ে বেশ তো ছুটোছুটি করছিল একটা বিপুল স্নেহের হৃৎপিণ্ড। কিন্তু আজ এমন কি ব্যাপার হল, যে-জন্যে বাড়ি ফিরে এসেই একটা অসাড় ক্লান্তির মত খাটের উপর লুটিয়ে শুয়ে রইলেন বিজনবিহারী।

নিরুপমা বার বার জিজ্ঞেস করেন, কি হল?

—কিছু না।

সুনন্দা বলে, কি হল বাবা?

বিজনবিহারী হাসেন: কিছু না। শুধু একটু একলা হয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।

অনেক রাতে সুনন্দা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন মোহিতের উপহার সেই বইটাও সুনন্দার বুকের ওপর পড়ে থাকে, যে-বইটার পাতায় পাতায় ভালবাসার গান ঘুমিয়ে আছে। তখন ও-ঘরের ভিতরে নিরুপমা তাঁর ঘুমহারা দুটো চোখের উদ্বেগ শান্ত করে নিয়ে প্রশ্ন করেন, কি হয়েছে এবার বল।

বিজনবিহারীও খাটের উপর উঠে বসেন। জোরে জোরে হাই তোলেন, আর গা-মোড়া দিয়ে ষাট বছর বয়সের শক্ত-পোক্ত আত্মাটার সব অবসাদ যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হেসে ওঠেন: কিছুই নয়; করালীবাবু নামে যে ভদ্রলোক হাওয়া বদলের জন্য এখানে এসেছেন, সেই ভদ্রলোক আজ হঠাৎ কয়েকটা বাজে কথা বলে ফেললেন।

—কি কথা?

—ভদ্রলোক বললেন, উনি আমাকে চেনেন। কথা শুনে মনেও হল, সত্যিই চেনেন।

—তুমি ভদ্রলোককে চেন না?

—তখন দেখে ঠিক চিনতে পারি নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত একটি ছেলে, নাম করালীকান্ত, হয়তো সে-ই হবে। যাই হক্‌···আর রাত করব না, দাও কিছু খেয়ে নিই।

—কিন্তু কি বললেন করালীবাবু?

—বললেন, আমি নাকি একজন বিদ্রোহী, গা ঢাকা দেবার জন্য এখানে এসে একটা চমৎকার বনবাস বেছে নিয়েছি। শুনে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল, এই যা। তা ছাড়া আর কিছু নয়।

নিরুপমার চোখের তারা থরথর করে কাঁপতে থাকে; সেই

কালো ছায়াটা যেন নিরুপমার চোখ ছুটোকে উপড়ে দেবার জন্য হিংস্র নখরে-ভরা একটা থাবা তুলেছে।

হেসে ফেলেন বিজনবিহারী: করালীবাবুর কথা বাদ দাও। আজ আর ওসব কথার কোন মানে হয় না।

বিজনবিহারীর আজকের এই হাসির শব্দটাও যে সেই নির্ভয় জীবনের প্রতিধ্বনি; যখনই সেই কালো ছায়াটা কাছে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে, তখনই বিজনবিহারীর বুকের ভিতরে যেন একটা সিংহের সাহস গরগর করে উঠেছে।

নিরুপমার কাছে বিজনবিহারীর এই হাসির শব্দটা যে একটা পরম সান্ত্বনার গান, শান্তি আর সম্মানের একটা নির্ভীক অঙ্গীকার; শোনা মাত্র শান্ত হয়ে গিয়েছে নিরুপমার কালো ছায়া-ভীরু প্রাণটা।

আজও, নিরুপমার চোখের তারা আর কাঁপে না। আতঙ্কিত মনটা হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। ঠিকই, আজ আর ওসব কথার কোন মানে হয় না। করালীবাবুর কথাগুলি শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের মান, সম্মান আর আনন্দের গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে পারবে না। সাধ্যি নেই।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যখন শুনতে পায় সুনন্দা, কাল রাতে বাবা ভাত খেয়েছিলেন, তখন সুনন্দারও চোখের তারা ছুটো হেসে ওঠে।

—চলি বেটি নন্দুয়া! সুনন্দার পিঠে হাত বুলিয়ে আর হেসে হেসে বিজনবিহারী যখন তাঁর মাটিসাহেবী মূর্তিটি নিয়ে আর সাইকেল ছুটিয়ে চলে যান, তখন অঘ্রাণের সকালের সব কুয়াশা গলে গিয়েছে। রোদ মেখে শিউলিবাড়ির ঘাসের সব শিশির হাসছে।

সারা ছুপুর ধরে রামসিংহাসনের চন্দনা শিস দেয়। কাটোয়ার সেই বাউল একবার এসে গান গেয়ে আর সিধে নিয়ে চলে যায়।

সোনার হারটা তৈরি হয়ে এসেছে। ঝুমরা রাজবাড়ির স্যাকরা এসে হারটা দিয়ে চলে গেল। মেয়ের গলায় হারটা একবার পরিয়ে দিয়ে দেখতে গিয়েই নিরুপমার চোখ ছলছল করে ওঠে।

সুনন্দা হাসে ঃ তুমি এরকম কেন করছ মা? আমি তো বেশ হাসছি।

বিকেলটা কিন্তু কাটতে চায় না। সুনন্দার চোখের দৃষ্টিটা উতলা হয়ে ওঠে, যেন বুকের ভিতরে হাস্নুহানার গন্ধ উতলা হয়ে উঠেছে। সেদিন যদি জয়ন্তী আর মনোরমা ওভাবে শাঁখ বাজিয়ে না ফেলত, তবে আজও বোধ হয় একবার ঝুমরা কলোনি বেড়িয়ে আসতে পারত সুনন্দা; এরকম অদ্ভুত একটা চক্ষুলজ্জার বাধা সুনন্দাকে এখানে অলস করে বসিয়ে রাখতে পারত না। জানতে ইচ্ছে করে, আজ এখন এই বিকেলের রোদের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে মোহিত?

বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই চমকে ওঠে সুনন্দা। যেন বিকেলের রোদটাই হেসে উঠে সুনন্দার এই জিজ্ঞাসার উত্তরটা দিয়ে দিয়েছে! মোহিতের চাকর রঘুনাথ একটা চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চিঠি দিয়ে চলে যায় রঘুনাথ; আর চিঠি পড়েই সুনন্দার চোখের হাসি আরও উচ্ছল হয়ে ওঠে। মোহিতের চিঠিটা যেন একটা দুরন্ত আকুলতার আহ্বান!—এমনি একবার এস সুনন্দা; একটুও দেরি করো না।

—আমি একটু ঘুরে আসছি, মা।

ঘরের ভিতর থেকে নিরুপমা বলেন, এস।

মোহিতের এই ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়েও দস্তিদার সাহেবের ফটকের মাধবীলতার বিতান দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাধবীলতার গায়ে সত্যিই থোকা-থোকা ফুলের ঝালর দুলছে, না থোকা-থোকা ঠাট্টার ঝালর দুলছে? ও ফুলের আভা কি লাল-মাণিকের আভা না লালচে আগুনের আভা? সুনন্দার চোখে দুটো যেন সব জ্ঞান আর সব বোধ হারিয়ে ফেলেছে। তাই ওভাবে এতক্ষণ ধরে আর অপলক চোখে ওই মাধবীলতার বিতানটার দিকে তাকিয়ে থেকেও কিছু বুঝতে পারছে না সুনন্দা। মোহিত বলেছে, বিয়ে হবে না; বিয়ে হতে পারে না।

—কেন?

—না; করালীকাকা যে-কথা বললেন, তাতে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া উচিত নয় সুনন্দা।

—কে তোমার করালীকাকা?

—আমার বাবার খুড়তুতো ভাই, আমাদের কেষ্টনগরের কাকা।

—কী বলেছেন করালীকাকা?

—শুনে তোমার লাভ নাই। আমি বলব না।

—লাভ আছে। কোথায় উনি?

—কেন?

—আমি তাঁরই কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করব।

—উনি নেই। কাল এসেছিলেন, আজ সকালেই চলে গিয়েছেন।

—কেন?

—তোমার বাবার ভয়ে?

—তার মানে?

—তার মানে উনি শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের দাপটের কথা জানতে পেরেছেন।

—এ-কথারই বা কি মানে হয় ?

—এখানে তোমার বাবা অনায়াসে কারালীকাকাকে দু'টুকরো করে কেটে ফেলতে পারেন ; মাটিসাহেবকে কেউ বাধা দেবে না, কেউ কিছু বলবে না।

—আমার বাবাকে এমন ভয়ানক বলে ধারণা হল কেন তোমার করালীকাকার ?

—তিনি তোমার বাবাকে চেনেন।

—চিনলে কি বাবাকে কেউ ভয়ানক বলে মনে করতে পারে ?

—যাঁরা ভাল করে তোমার বাবাকে চেনেন, তাঁরা তোমার বাবাকে ভয়ানক বলেই মনে করবেন।

—মিথ্যে কথা। তোমার করালীকাকা ভয়ানক মিথ্যেবাদী।

—মাটিসাহেবই একটি ভয়ানক মিথ্যে।

—কি বললে ?

—ঠিক কথা বলেছি, সুনন্দা। তুমি কিছু জান না বলেই রাগ করে আমার সঙ্গে এত তর্ক করছ।

—তুমি জানিয়ে দিতে ভয় পাচ্ছ কেন ?

—ভয় নয়, মায়ার জন্যে জানাতে পারছি না।

—একটুও মায়ার দরকার নেই ; তুমি এখনি জানিয়ে দাও। আমি দু'কান দিয়ে শুনব।

—তবে শোন।

—বল।

—তোমার বাবা এক ভদ্রলোকের এক মিথ্যে ছেলে।

—কি ?

—সে ভদ্রলোকের বিবাহিতা স্ত্রীর ছেলে নয়, একটা স্ত্রীলোকের ছেলে। আর তুমিও…।

—বল, চুপ করলে কেন ?

—তুমিও তোমার বাবার একটি স্ত্রীলোকের মেয়ে, বিবাহিতা স্ত্রীর মেয়ে নও।

—বল, আর যা কিছু জান, সব বল। শুনতে বেশ লাগছে।

—যে বিধবাকে ঘরছাড়া করে নিয়ে এসে শিউলিবাড়িতে ঘর বেঁধেছেন তোমার বাবা, সেই বিধবা হলেন তোমার ওই মা।

সারা শিউলিবাড়ি দাউ দাউ করে পুড়ছে; সেই সঙ্গে পুড়ছে আর ছাই হয়ে যাচ্ছে সুনন্দার চোখ মুখ আর ফুসফুস। জানলার গরাদটাকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে সুনন্দা। ঢিপ করে একটা শব্দ গুমরে ওঠে। মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে সুনন্দার মাথাটা গুমরে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে মোহিত—সুনন্দা!

আঘ্রাণের সন্ধ্যার বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা, আর মোহিতও ঠাণ্ডা জলে তোয়ালে ভিজিয়ে সুনন্দার মাথা মুছে দিয়েছে। তাই সুনন্দার মূর্চ্ছাটাও যেন একটা হিমাক্ত ভয়ের ছোঁয়া লেগে শিউরে উঠে। চোখ মেলে তাকায় সুনন্দা। কথাও বলে সুনন্দা।—কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে তোমার বাধা কোথায়? এখানে তো কেউ বাধা দেবে না। এখানেও তো চক্রবর্তী ঠাকুর আছেন, আশীর্বাদ করবার মানুষও আছে।

—ঠিক কথা; এখানে তোমার বাবার দাপটের ভয়ে যত শাস্তর মন্তর আর আশীর্বাদ সবাই বিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু তাতে তো আমার মন ভরবে না। ওটা একটা ঠাট্টার ব্যাপার হবে, কলকাতার ছাতুবাবু যেমন ঘটা করে বিড়ালের বিয়ে দিয়েছিলেন।

একেবারে সুস্থির হয়ে বসে, আর দুই চোখ অপলক করে মোহিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুনন্দা; মোহিত নয়, যেন সুনন্দার ভাগ্যের ঈশ্বর কথা বলছে। ঠিকই তো, মানুষের ছেলে এমন একটা মেয়েজন্তুকে বিয়ে করবে কেন? মানুষের ছেলের যে দেশ বাড়ি গাঁই গোত্র আছে। নিয়মের সন্তান হয়ে এমন একটা অনিয়মের প্রাণীকে বিয়ে করতে ভয় না করে পারবে কেন মোহিত?

মোহিত বলে, তুমি বোধ হয় আমার কথাটা ঠিক বুঝতে না

পেরে আমাকেই ভুল বুঝেছ। কথা হল, তোমাকেই যদি ঘরে নিয়ে আসি, তবে বিয়ে করবার দরকার কি ?

চমকে ওঠে সুনন্দা। মোহিতের কথার অর্থটা সত্যিই বুঝতে পারা যাচ্ছে। সুনন্দার অপলক চোখের উপর থেকে এতক্ষণের উত্তপ্ত বাষ্পের আবরণও যেন হঠাৎ একটা চমক লেগে ছিঁড়ে যায়। চোখের শুকনো খটখটে তারা দুটো প্রখর হয়ে জ্বলতে থাকে।—কি বললে ?

—বলছি, আমি আমার ভালবাসার অপমান করতে পারব না, তোমারও অপমান হতে দেব না। তুমি আমারই ঘরে আসবে ; আমার কাছে থাকবে।

মাটিসাহেবের আদুরে মেয়ের হৃৎপিণ্ডটাকে কেউ যেন নর্দমার পাঁকের মধ্যে চেপে ধরে গলা টিপে ধরেছে। বোবার আর্তনাদের মত একটা যন্ত্রণার শব্দ যেন সুনন্দার গলা ছিঁড়ে দিয়ে ঠিকরে ওঠে।—কি বললে মোহিত ?

—আমি আর এখানে থাকব না সুনন্দা। আজই চলে যাব। আর তোমাকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।

—কোথায় যাবে ?

—ধরে নাও, অনেক দূরে কোথাও। রায়পুর কিংবা নাগপুর।

—কিন্তু আমি সেখানে কেন যাব ?

—যদি আমাকে ভালবেসে থাক, তবে নিশ্চয় যাবে, যেতে হবে।

—আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে কি করব ?

—আমার কাছে আমার ঘরে থাকবে।

—কেমন করে থাকব ? চেঁচিয়ে ওঠে সুনন্দা।

—তোমার মা যেমন করে তোমার বাবার সঙ্গে রয়েছেন। মোহিতের শান্ত শিক্ষিত সবল ও অবিচলিত দুটো কৌতূহলের চোখ সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মাথা হেঁট করে ফুঁপিয়ে ওঠে সুনন্দা : উঃ, মাগো !

—সুনন্দা ! সুনন্দার একটা হাত ধরে ডাক দেয় মোহিত।

চমকে ওঠে সুনন্দা। সত্যিই যে একটা সান্ত্বনার হাত বলে মনে হয়। মুখ তুলে তাকিয়ে আরও আশ্চর্য হয়, মোহিতের দুই চোখ ছলছল করছে। যেন একটা ভয়-পাওয়া ভালবাসা করুণ হয়ে তাকিয়ে আছে।

চুপ করে কি যেন ভাবে সুনন্দা; বোধ হয় ভাগ্যের একটা ভ্রূকুটিতে চূর্ণ করে দেবার জন্য সুনন্দার বুকের সব নিশ্বাস দুরন্ত একটা সাহস পেতে চাইছে। কিন্তু সুনন্দার সব নিশ্বাসের ভার হঠাৎ যেন শ্রান্ত হয়ে যায়। ভ্রূকুটিটাই বলছে, যেতেই যে হবে, উপায় নেই।

সুনন্দা বলে, বেশ। কখন যাবে?

—শেষ রাত্রের ট্রেনে।

—আমাকে কি করতে হবে?

—তুমি স্টেশনে চলে আসবে।

॥ তেইশ ॥

সিংহানি কোলিয়ারীর বাঁশির শব্দটা শালবনের উপর দিয়ে ভেসে এসে ঘুমন্ত শিউলিবাড়ির বাতাসকেও একটু সজাগ করে দিয়ে মিলিয়ে গেল। কয়লার ট্রেনটারও চাকা-গড়ানির শব্দটা দূরে চলে গেল। কাজেই ধরে নিতে পারা যায়, রাতের প্রহর ফুরিয়ে আসছে, দুটো বেজে গিয়েছে।

নিরুপমার ঘুম হঠাৎ ভেঙে গিয়েছিল, তাই দেখতে পেলেন, ও-ঘরে একটা আলো জ্বলছে, আর সুনন্দাও পাশে নেই।

এত রাতে কি করছে মেয়েটা? আজ ভাত খাওয়ার পর যে মেয়ে নিজেই গরজ করে বলল, আজ আমি তোমার কাছে শোব মা, সে-মেয়ের মনে আবার এ কেমন খেয়াল দেখা দিল? মায়ের পাশে শোবার লোভটা এরই মধ্যে মরে গেল? আর বই পড়বার লোভ হল?

ও-ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে আর উঁকি দিয়েই চমকে ওঠেন নিরুপমা। ফিরে এসে বিজনবিহারীর ঘুমন্ত বুকটাকে ঠেলা-ঠেলি করে, আর যেন একটা করুণ আতঙ্কের স্বর চেপে চেপে ডাক দিতে থাকেন, শুনছ? শিগগির ওঠ; নন্দু কি কাণ্ড করছে দেখ।

বিজনবিহারীও চমকে জেগে ওঠেন: কি হল?

—নন্দু কি-যেন লিখছে আর কি-ভয়ানক কাঁদছে।

—কেন?

সত্যি তো কেন? যে মেয়ে আজ রাত্রে ইচ্ছে করে বাবার পাতে ভাত খেয়েছে, ইচ্ছে করে মার গা ঘেঁষে ঘুমিয়েছে, সে মেয়ে ঘুম ছেড়ে দিয়ে এই নিষুত রাতে একলা ঘরে বসে বসে কাঁদবে কেন?

সুনন্দার কাছে গিয়ে দাঁড়ান বিজনবিহারী আর নিরুপমা।—কি লিখছিস নন্দু? বিজনবিহারী ডাকেন।

—কাঁদছিস কেন নন্দু? নিরুপমা ডাকেন।

লেখাটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আর চোখ মুছে নিয়ে সুনন্দা বলে, আমাকে এখনই চলে যেতে হবে, মা।

চমকে ওঠেন নিরুপমা: কোথায় যাবি?

—মোহিত যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে।

বিজনবিহারী বলেন, কি বললি নন্দু?

—আর জিজ্ঞেস কর না, বাবা।

—পাগলের মত কথা বলছিস কেন? এখন আবার মোহিত তোকে কোথায় নিয়ে যাবে? বিয়ের পর যাবে।

—বিয়ে হবে না, মা।

নিরুপমা যেন সুনন্দার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুনন্দাকে দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকেন: কি হল নন্দু? একথা কেন বলছিস নন্দু?

—বিয়ে হতে পারে না।

—কেন?

—মোহিতের কাকা করালীবাবু যে-কথা বলে দিয়ে গেছেন, তার পর আর বিয়ে হতে পারে না।

—করালীবাবু যা ইচ্ছে হয় তাই বলুক; কিন্তু মোহিত তো অবুঝ ছেলে নয়।

—মোহিত খুব সবুঝ ছেলে; মোহিতই তোমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী নয়।

—কিছুই বুঝতে পারছি না নন্দু। মোহিত তোকে বিয়ে করবে না, তবু তোকে নিয়ে যাবে, একি বিশ্রী কথা, কুৎসিত কথা, ভয়ংকর কথা বলছিস নন্দু?

—তুমি বুঝতে পারবে না কেন?

—অ্যাঁ? কি বললি?

—বুঝে দেখ। তুমি যা করেছ, তোমার মেয়েও তাই করবে।

সুনন্দার মাথাটাকে দু'হাত দিয়ে টেনে বুকের উপর চেপে ধরে

হাঁপাতে থাকেন নিরুপমা ঃ আমাকে ক্ষমা করে দে, নন্দু। আমার কথা ছেড়ে দে নন্দু। তুই যেতে পারবি না।

—যেতেই হবে মা।

—না না, কেন যাবি ? কখ্‌খনো না।

—অনেক সাহস করেছ, অনিয়মের মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করেছ আর পুষেছ। কিন্তু আর বোধ হয় সাহস করতে পারবে না।

—খুব সাহস আছে। চিরকাল পুষব।

—না পারবে না ; মেয়ের কোলে একটা অনিয়মের ছেলেকে দেখতে পেলে, তাকে আদর করবার সাহস হবে না।

—এ কি সর্বনেশে কথা বলছিস ?

—ভাগ্যের কথা বলছি। মরতে সাহস হচ্ছে না বলেই চলে যেতে হচ্ছে।

বিজনবিহারী বলেন, নন্দুকে ছেড়ে দাও নিরু। ওকে যেতে দাও!

বিজনবিহারীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে সুনন্দা।—আমি মরতেই যাচ্ছি বাবা ; তুমি বাধা দিয়ো না।

—না, বাধা দেব না ; কেন দেব ? দু-হাত দিয়ে সুনন্দার হাত দুটোকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন বিজনবিহারী, আর টেনে তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন।

নিরুপমার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন বিজনবিহারী ; গলার স্বর যেন শান্ত বজ্ররব।—তুমি ওঘরে চলে যাও নিরু।

মুখটাকে দু'হাতে শক্ত করে চেপে আর টলতে টলতে ও-ঘরের ভিতরে গিয়ে মেঝের উপর আছড়ে পড়েন নিরুপমা।

তারপর বিজনবিহারী এদিকে-ওদিকে বা পিছনে, কোন দিকে না তাকিয়ে, আস্তে আস্তে পা ফেলে, শুধু পায়ের তলার মেঝেটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ও-ঘরের ভিতরে গিয়ে খাটের উপর বসে পড়েন।

শিউলিবাড়ির রাতটাও যেন মরণঘুম ঘুমিয়ে নিতে থাকে। নীরব

নিরেট একটা স্তব্ধতা। ওই ঘরে আর সেই বাতিটা জ্বলছে না। খোলা দরজা দিয়ে হিমের কুয়াশা হু হু করে ঘরের ভিতরে ঢুকছে। কে জানে কখন চলে গিয়েছে সুনন্দা।

নিরুপমার তন্দ্রাটাও যেন একটা মূর্চ্ছা। কাঁদবার শক্তিটাও অসাড় হয়ে গিয়েছে। যেন একটা অভিশাপের পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন নিরুপমা।

কিন্তু মূর্চ্ছাটাও যেন আর নীরব হয়ে এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। তাই হঠাৎ একবার ধড়মড় করে উঠে বসেন আর চোখ মেলে তাকান নিরুপমা। না, ওঘরে আর আলো নেই; কিন্তু এঘরে কেন আলো জ্বলছে? নিরুপমার নিথর চোখ দুটো অবুঝের মত তাকিয়ে সারা ঘরের শূন্যতার অর্থটাকে যেন বুঝতে চেষ্টা করে। সে গেল কোথায়? খাটের উপরে চুপ করে বসেছিল যে পাথর মানুষটা?

চমকে ওঠে নিরুপমার অবুঝ চোখ। মানুষটা যে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে হাসছে। বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়েছে; এইবার টোটার মালাটার দিকে হাত বাড়িয়েছে।

ছুটে এসে দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো টোটার মালাটা তুলে নিয়ে সরে যান নিরুপমা। টোটার মালাটাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে আর দু-হাত দিয়ে বুকের কাছে চেপে রেখে চেঁচিয়ে ওঠেন: তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মীটি। তুমি বন্দুক রেখে দাও।

—একটা টোটা দাও নিরু। আমি চলে যাই।

—না।

—আমি রাগ করে কথা বলছি না, নিরু। বিশ্বাস কর, কারও ওপর আজ আমার একটুও রাগ নেই।

কী শান্ত আর কত স্নিগ্ধ ও মৃদু একটি চেহারা! গায়ে গেঞ্জি, পায়ে চটি, ধুতির কোঁচাটাকে তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজে দিয়েছেন। কাঁধ আর বুকের ফর্সা রঙটা ধবধব করছে। মাথার চুলের সব সাদাও আলো লেগে চিকচিক করছে। বিজনবিহারী যেন হেসে হেসে

এই ঘরের একটা চমৎকার সাধের কাজ সেরে ফেলবার জন্য বন্দুকটাকে আদর করে হাতে তুলে নিয়েছেন।

—ভাবতে শুধু আশ্চর্য লাগছে, নিরু। বুঝতেই পারছি না, কি-এমন ভুল-টুল করলাম যে-জন্যে আজও আমি চোরই রয়ে গেলাম। কি আশ্চর্য, ঠিক সময় বুঝে চলে এল সেই অভিশাপের রাগ। ধন্যি অভিশাপ রে বাবা!

হাসতে থাকেন বিজনবিহারী। যেন মনখোলা প্রাণখোলা একটা ঠাট্টার হাসি, সে হাসির আড়ালে এক ফোঁটা ঝাঁঝ নেই, জ্বালা নেই, ধিক্কার নেই।

নিরুপমা বলেন, আমার একটা কথা শুনবে?

—বল।

—তুমি শুয়ে পড়।

বিজনবিহারী নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনই হাসিমুখে আর শান্ত স্বরে বলেন, তুমি আমার একটি কথা শুনবে?

—বল।

—আমার কাছে এসে বস।

নিরুপমার উদ্বিগ্ন চোখ দুটো এইবার বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বিজনবিহারী ডাকেন, এস নিরু।

ঘর-সংসারের গম্ভীর ডাক নয়। চিন্তার ডাক নয়, কাজের ডাক নয়। যেন খেলার সাথীর ডাক। বিজনবিহারী তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনসঙ্গিনীর একটা অভিমানিত অনিচ্ছা আর কৃপণতাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে যেন বাজে খরচের জন্য একটি টাকা আদায় করে নেবার মতলবে আদরের সুরে কথা বলছেন।

নিরুপমা উঠে এসে খাটের কাছে দাঁড়ান। বিজনবিহারী তাঁর পাশের জায়গাটাকে দেখিয়ে দিয়ে নিরুপমাকে আরও স্নিগ্ধ স্বরে অনুরোধ করেন, এখানে বস, আমার কাছে বস নিরু।

নিরুপমা বসেন। বিজনবিহারী হাত পাতেন। যেন একটা

মিষ্টি মায়ার কাছে, যে মায়া একটুতেই গলে যায়, তারই কাছে আবেদন করেছেন বিজনবিহারী ঃ দাও নিরু।

নিরুপমার মায়ার প্রাণ তবু যেন গলতে চায় না। আঁচল দিয়ে জড়ানো টোটার মালাটাকে আরও সাবধানে আর শক্ত করে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে রাখেন নিরুপমা।

বিজনবিহারী হাসেন ঃ তুমি মিছে কেন কিপটেমি করছ, নিরু? বুঝতে পারছ না কেন, আমি যে শাস্তিটাকে জব্দ করে দিতে চাই। শিউলিবাড়ির মাটিসাহেব মাথা হেঁট করেছে; একটা ভীতু কুষ্ঠরোগীর মত স্টেশন রোডের এক কিনারা ধরে চুপি-চুপি চলে যাচ্ছে, এমন মজার দৃশ্য তো সম্ভব নয়।

নিরুপমা তবু অবিচল।—না, তুমি আর যা-ই বল, ওকথা বলো না।

—না; না। তুমি আমাকে বাধা দিয়ে বিরক্ত করো না। আমি কারও কাছে হার মানতে পারব না নিরু; ভাল ছেলেটি হয়ে যার-তার হাতে মার খাওয়ার জন্যে বেঁচে থাকা আমার পোষাবে না।

ষাট বছর বয়সের গলার স্বরের সঙ্গে যেন ষোল বছর বয়সের দুরন্ত বিজুর সেই বিদ্রোহের গর্জন আজও কথা বলছে। বিজন-বিহারীর শান্ত গলার স্বর সত্যিই এবার একটু দুরন্ত হয়ে উঠেছে। বুঝতে আর অসুবিধে নেই, বিজনবিহারীর এই দুরন্তপনা আজ আর কোন সান্ত্বনায় শান্ত হবার নয়।

নিরুপমা বলেন, তবে শুধু একটা টোটা চাইছ কেন? দুটো নাও।

বিজনবিহারী যেন একটু চমকে উঠেন, কি বললে?

নিরুপমার চোখ দুটোও হঠাৎ যেন একটা আশার ছবি দেখতে পেয়েছে, তাই চোখের তারা দুটোতে অদ্ভুত এক ইচ্ছার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে হাসতে শুরু করেছে।—আমিও যাব।

—কেন?

—কেন আবার কি? তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলে, তুমি এবার সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

—অ্যাঁ ?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ব্যস্ত লোভীর মত আবার হাত পাতেন বিজনবিহারী ঃ দাও, তাহলে দুটো টোটাই দাও।

বন্দুকের নলটাকে এক হাত দিয়ে টেনে নিয়ে আর নিজেরই বুকের কাছে ঠেকিয়ে রেখে, আর এক হাতে টোটার মালাটাকে বিজনবিহারীর কোলের উপর ফেলে দেয় নিরুপমা।

বিজনবিহারী বলেন, ছিঃ, এরকম হুটোপুটি করো না নিরু। এতদিন যেমন আমাকে বিশ্বাস করেছ, তেমনই আজও বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে একলা ফেলে রেখে যাব না।

নিরুপমা যেন লজ্জিত হয়ে হাসেন; সত্যিই হাতটা হঠাৎ অবিশ্বাসী হয়ে বন্দুকের নলটাকে আঁকড়ে ধরেছে; যেন নিরুপমাকে একলা ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে না পারেন বিজনবিহারী। ছি ছি, কি বিশ্রী অবিশ্বাস। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নিরুপমাকে বুকের কোটরে পুরে বেঁচে আছে যে-মানুষটা, সে কি নিরুপমাকে আজ ধুলোর উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারে ?

—না না, অবিশ্বাস করছি না। বন্দুকটা ছেড়ে দিয়ে যেন একটা স্বস্তিময় নির্ভাবনায় হাঁপ ছাড়েন নিরুপমা।

বিজনবিহারী বলেন, তোমাকে কেন মিছিমিছি যত অপমান আর লজ্জার মধ্যে ফেলে রেখে যাব ? কখ্খনো না। কিন্তু···।

দুটো টোটা আর বন্দুকটাকে দু'জনের মাঝখানের ছোট ব্যবধান-টুকুর উপর শুইয়ে রেখে দিয়ে বিজনবিহারী এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি যেন ভাবেন।

নিরুপমা বলেন, কি খুঁজছ ?

—খুঁজছি না; ভাবছি, বিছানাটা রক্তে ভেসে গেলে কি ভাল দেখাবে ? কাজটা ও-ঘরের মেঝের উপর হলেই ভাল হত নাকি ?

—না; ও-ঘরে নন্দুর ফটোটা রয়েছে।

—ওঃ, না, তাহলে ও-ঘরে নয়।

—আমি তো বলি, এই খাটের উপরেই ভাল। কিন্তু…।

—কি ?

—আমাকে এখানে একা শুইয়ে রেখে তুমি আবার এদিকে-ওদিকে সরে গিয়ে পড়ে থেক না।

—না না, তা কি হয়! আমি ঠিক তোমার পাশেই শুয়ে পড়ব।

—আমি তো দেখতে পাব না ; কিন্তু আমার হাতটা তবু ধরে রেখ লক্ষ্মীটি, কেমন ?

—নিশ্চয়। সে কথা আর বলতে হবে ? নিরুপমার একটা হাত ধরেন বিজনবিহারী।

—এখনই ?

—সেটা জেনে তোমার কি লাভ হবে বল ? যখনই হক, ভোর হবার আগেই হয়ে যাবে।

বিজনবিহারীর কাঁধের উপর মাথাটাকে এলিয়ে দেন নিরুপমা। বিজনবিহারী খুশি হয়ে বলেন, হ্যাঁ, এই ভাল। তুমি এবার চোখ বন্ধ করে একটু ঘুমিয়ে নাও।

—তুমি কিন্তু আমাকে ঘুমের মধ্যেই…।

—না না ! ঘুম ভাঙবার পর।

—হ্যাঁ, আমি চোখ মেলে তোমাকে একবার দেখব, তারপর মনে থাকে যেন।

—নিশ্চয়।

বিজনবিহারীর কাঁধের উপর নিরুপমার মাথাটা, যেন একটা নিশ্চিন্ত ঘুমের স্বপ্নভারে ঢলে পড়ে থাকে। বিজনবিহারীও তাঁর একটা হাত নিরুপমার কাঁধে তুলে দিয়েছেন। দু'জনের মাঝখানে একটা বন্দুক আর দুটো টোটা, যেন একটা ফুলমালা আর দুটো ফুল। আর ঘরটা যেন বাসরঘর। শিউলিবাড়ির ষাট বছর বয়সের মাটিসাহেব আর তাঁর পঞ্চান্ন বছর বয়সের জীবনসহচরী যেন এক পরম মিলনের বর আর বধূ। খোলা দরজা দিয়ে অঘ্রাণের কুয়াশা হু হু করে ঘরের ভিতরে ঢুকছে ; কিন্তু বাতিটা নিবছে না।

॥ চব্বিশ ॥

অঘ্রাণের কুয়াশা কিন্তু এরই মধ্যে সুনন্দার খোঁপার উপর কুচি-কুচি শিশির ছড়িয়ে দিয়েছে। সুনন্দার গায়ে শাড়িটাও স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে।

শিউলিবাড়ির স্টেশন নয়; দূরের সিগন্যালের লাল চোখটা যেখানে ঘোলা রক্তের আভার মত কুয়াশার বুকের একটা ক্ষত হয়ে জ্বলছে, সেখানে রেল লাইনের পাশে একটা মাথাভাঙা মরা শিমূলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দা।

ঠিকই, স্টেশনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল সুনন্দা। কিন্তু স্টেশনের মাথার উপরের বড় আলোটার দিকে চোখ পড়তেই সুনন্দার চোখ দুটো যেন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়েছিল সুনন্দা। সেই ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখ দুটোও কিছুক্ষণ ধরে দপ্ দপ্ করে জ্বলেছিল।

না, ওই আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া যেমন আর দূরের ওই অন্ধকারের লাইনের উপর মাথা পেতে পড়ে থাকাও তেমনি, দুইই মরণ। শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের মান-সম্মানের প্রাণটা তাঁর মেয়ের এই দুই মরণের কোন একটি মরণ দেখতে পেলে একই যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে মরে যাবে। এভাবে মানুষের ছেলের সঙ্গে চলে গেলে অমানুষের মেয়ের প্রাণটাও কি সম্মানের বাঁচা বাঁচতে পারবে? না, অসম্ভব! দুরাশার চেয়েও মিথ্যে আশা! তুমি বিজনবিহারী নও মোহিত, আর আমিও নিরুপমা নই। মাটিসাহেবের পায়ের ধুলোতে যে সাহস আছে, তোমার বুকেও সে সাহস নেই। নিরুপমার ছায়ার বুকটাতে যে ভালবাসা আছে, আমার এই রক্তমাংসের বুকের ভিতরেও সে ভালবাসা নেই।

না, শুধু এই শরীরটার একটা গোপন লজ্জার ভয়ে তোমার

মত মানুষের ঘরে গিয়ে পড়ে থাকবার কোন মানে হয় না। একটা অনিয়মের মেয়ের প্রাণের সঙ্গে আর একটা যে অনিয়মের প্রাণ লুকিয়ে আছে, সেটাও চলে যাক। কাঁটা আর কাঁটার ফুল এক সঙ্গেই মরে যাক। কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব না। কখ্খনো না। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমাকে ভয় করে; তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। তোমার কাছে থাকা মানে একটা চমৎকার রঙচঙে ভীরুতার দাসী হয়ে পড়ে থাকা।

না, দুইই সমান অসম্মানের মরণ কেন হবে? তোমার সঙ্গে চলে যাওয়া মরণের চেয়ে ওই অন্ধকারের এক কোণে রেল লাইনের উপর মাথা পেতে দিয়ে মরে পড়ে থাকা বরং সম্মানের মরণ। তোমার মত আলোর জ্বালার কাছে মরে যাওয়ার চেয়ে ঢের ভাল।

স্টেশনের আলোটাকে যেন একটা ঘেন্নার ভ্রুকুটি দিয়ে তুচ্ছ করে দপ্দপ্ করেছে সুনন্দার দুই চোখ। তার পরেই এই অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছে, যেখানে একটা মাথাভাঙা মরা শিমূল একলা দাঁড়িয়ে আছে, আর শিশিরে ভিজে গিয়ে পিছল হয়ে গিয়েছে রেল লাইন।

শেষ রাতের ট্রেনটা আসছে বোধ হয়। অনেক দূরে, ঘুমন্ত শালবনের বুকের গভীরে যেন একটা গম্ভীর শব্দের মিহি বোল গুরগুর করে বাজছে। আঁচল দিয়ে কোমরটাকে শক্ত করে জড়িয়ে বাঁধে সুনন্দা। দু' পা এগিয়ে গিয়ে, শান্ত প্রতীক্ষার একটা আবছায়া হয়ে আর কান পেতে যেন অঘ্রাণের কুয়াশার একটা গান শুনতে থাকে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সুনন্দার একেবারে চোখের কাছে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় একটা ছায়া: বাড়ি ফিরে চলুন।

এ আবার কোন্ রহস্যের দাবী এসে কথা বলছে? এ সময়ে এখানে, অঘ্রাণের শেষ-রাতের এই হিমেল কুয়াশার ভিতরে এ কোন্ শাসনের ধমক কেমন করে কখন এসে আর কতক্ষণ ধরে লুকিয়েছিল? পুষ্কর দত্ত যে সত্যিই শিউলিবাড়ির একটা রাতজাগা চক্রান্ত।

সুনন্দার দুঃসাহসের চোখ দুটো আশ্চর্য হয়ে আর ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। কাঁপতে থাকে।

ঠিকই, বেশ মৃদুস্বরে কথা বলছে একটা চক্রান্তের মন।—আমি হঠাৎ এসে পড়ি নি। ইচ্ছে করেই এসেছি। আমি আজ এই জন্যে তৈরি হয়েই ছিলাম।

সুনন্দার হঠাৎ-ভীরু মূর্তিটা এবার পাথরের মূর্তির মত কঠোর হয়ে ওঠে। কথা বলে না সুনন্দা। পুষ্করের শক্ত ছায়াটাকে যেন একটা নীরব তুচ্ছতার আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু কুয়াশার মধ্যে যেন বিনীত একটা অনুরোধ কথা বলতে থাকে।—আপনি আশ্চর্য হবেন না, ভয় পাবেন না।

তবু কথা বলে না সুনন্দা। কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু শুনতে পায়, এবার যেন একটা দুশ্চিন্তার প্রাণ কথা বলছে।—আমার আজ সন্দেহ হয়েছিল, আপনি এরকম একটা কাণ্ড করতে চাইবেন।

সুনন্দার নিরুত্তর মূর্তিটা একটুও বিচলিত হয় না।

এবার যেন ভয়ানক একটা সবজান্তা আত্মা মায়া করে কথা বলতে শুরু করেছে।—আপনি মোহিতবাবুর ব্যবহারে দুঃখ পেয়ে যা করতে চাইছেন, সেটা আপনার বাবার আর মা'র অপমান। আপনারও অপমান।

সুনন্দার মাথায় যেন হঠাৎ একটা ঝিম ধরে যায়। চোখ দুটোও চমকে ওঠে। কী সাংঘাতিক এই পুষ্কর দত্তের চোখ আর কান; যেন আড়ালে আড়ি পেতে সুনন্দার ভালবাসার বিপদের সব ভাষা শুনেছে, সব ঘটনা দেখেছে।

যেন কথা বলছে একটা ভুল বুঝিয়ে দেওয়া সান্ত্বনা—মোহিতবাবু তাঁর করালীকাকার কাছ থেকে একটা গল্প শুনে খুব অন্যায় আর খুব ভুল করলেন; কিন্তু সেজন্যে আপনিও ভুল করবেন কেন?

সুনন্দার বুকের ভিতরে একটা আর্তনাদ গুমরে উঠতে চায়। কিন্তু জোর করে ঠোঁট চেপে রেখে আর নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা।

কি আশ্চর্য, এইবার যেন সতর্ক চক্ষু একটা পাহারার প্রাণ কথা

বলছে।—আপনার ঘরে রাত ছটোর সময় আলো জলতে দেখেই মনে হল, আপনি একটা গণ্ডগোল বাধিয়েছেন।

যন্ত্রণাভরা একটা নিশ্বাসকে ঢোঁক গিলে শান্ত করতে চেষ্টা করে সুনন্দা।

অঘ্রাণের কুয়াশাটা এবার যেন বেশ ব্যথিত স্বরে আক্ষেপ করছে—আপনি আজ আপনার বাবা আর মা'কে যে-সব কথা বললেন, সেগুলো খুব অন্যায় কথা, খুব বাজে কথা।

সুনন্দার চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। সবই কুয়াশা বলে মনে হয়। কিন্তু শুনতে কোন অসুবিধে নেই ; বেশ স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, যেন দুরন্ত একটা সন্ধানের প্রাণ কথা বলছে।- আপনি সত্যি ঘর ছেড়ে চলে এলেন দেখে আমাকে অগত্যা আপনার পিছু পিছু আসতে হল। যাই হক, দেখে খুশি হলাম যে স্টেশনে গেলেন না।

সুনন্দার হৃৎপিণ্ডটাই শিউরে ওঠে ; তবু কথা বলতে পারে না। দুর্বহ একটা বিস্ময়ের ভার সহ্য করতে গিয়ে চোখ বন্ধ করে সুনন্দা।

কিন্তু কথা বলছে একটা স্নিগ্ধ আবেদন—আপনি এখানে এসেও খুব ভুল করেছেন। বাড়ি চলুন।

সুনন্দার নিশ্বাসের বাতাসটা যেন ফুঁপিয়ে হেসে উঠতে চায়। কিন্তু সে নিশ্বাসকেও সামলে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা।

এবার যেন একটা লজ্জিত কৈফিয়তের প্রাণ এলোমেলো ভাষায় কথা বলতে থাকে।—অবশ্য আপনাকে এখানে আসতে না দিয়ে ওখানে বাড়ির কাছেই বাধা দেব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু ভয়ও ছিল, আপনি আমার কথা শুনবেন না। উল্টে হয়তো আমাকেও সন্দেহ করবেন। তা ছাড়া, তখন বোধ হয় আপনাকে এত কথা বলতেও পারতাম না।

কথা বলে সুনন্দা ; একটা শুকনো পাথরের গলার শান্ত আর ঠাণ্ডা স্বর।—আপনি চলে যান।

—না।

—আমি একজনের সঙ্গে চলে যাব, তাতে আপনি বাধা দেবেন কেন?

—চলে তো যান নি।

—যদি যেতাম, তবে?

—তবে বাধা দিতাম।

—কেমন করে? মোহিতবাবুকে ছুরি মারতেন?

—দরকার বুঝলে মারতাম!

—দরকার বুঝলে আমাকেও বোধ···।

—কথা বাড়াবেন না। বাড়ি চলুন।

—না। আপনি যান।

—আমি যাব না।

—কেন যাবেন না? তুচ্ছ মানুষের একটা তুচ্ছ মেয়েকে তুচ্ছ করে চলে যেতে আপনারই বা বাধছে কেন?

—আমি কাউকে তুচ্ছ করি না।

—শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবকে আপনি তুচ্ছ করেন না?

—সে খোঁজে আপনার দরকার কি?

—মাটিসাহেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করবার সাহস আপনার আছে? তিনি তো আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

—সাহস নেই; অভ্যেস আছে।

—কিন্তু আর কি সে অভ্যেস থাকবে?

—তার মানে?

—করালীবাবুর কাছে থেকে খবর শুনে মাটিসাহেবকে চিনতে পারবার পরেও কি সে অভ্যেস থাকবে?

—ও-খবর আমি পাঁচ বছর আগেই জেনেছি।

চমকে ওঠে সুনন্দা। বুকটাকে খুব জোরে ব্যথা দিয়ে ছোট্ট একটা আনন্দ যেন চমকে উঠেছে। আস্তে একটা হাঁপ ছাড়ে সুনন্দা: কিন্তু আমাকে তো তুচ্ছ করতে পারেন।

—না। কোনদিন তুচ্ছ করি নি, আজও করি না।

—কে বলেছে ?

—পুষ্কর বলেছে।

সুনন্দা এসে বলে, হ্যাঁ, চাচিজী।

ঘরের ভিতরে যেমন বিন্ধ্যাচলীর খুশির হাসি ছড়িয়ে গড়িয়ে ছুটোছুটি করে, তেমনই ঘরের বাইরেও এক একটা খুশির হাসি হঠাৎ এসে এসে বিজনবিহারীর বারান্দাটাকে হাসিয়ে দিয়ে চলে যায়। খবরটাকে যেন সারা শিউলিবাড়ির প্রাণ খুশি হয়ে অভ্যর্থনা করছে।

সর্দার সুচেত সিং আসেন আর হাসেন।—বড় ভাল খবর মাটিসাহেব। শুনে খুব খুশি হয়েছি।

ফুলনবাবু আসেন: খুব ভাল হল মাটিসাহেব। পুষ্কর বড় ভাল ছেলে।

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী আর সেনবাবুর স্ত্রী ব্যস্তভাবে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।—মিষ্টি কই নিরুদি? আজ কিন্তু শুধু আপনার মেয়ের মিষ্টি মুখটি দেখেই ফিরে যাব না।

জয়ন্তী আর মনোরমা, সেই সঙ্গে একদল ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে এসে বারান্দার উপরে বিজনবিহারীকে ঘিরে ধরে। জয়ন্তী বলে, আমরা কিন্তু সুনন্দাদির বিয়েতে থিয়েটার করব।...বল না মনু।

মনোরমা বলে, জয়ন্তী হল নাগলতা, আর আমি হলাম কাশ্মীরের রাজা চক্রবর্মা।...তুই বল না জয়ন্তী।

—সত্যিই বলতে কান্না পায়। নাগলতা বলছে: দাও দুঃখ, দাও ক্লেশ, দাও চিন্তাবহ্নিজ্বালা, সকলি সহিব হাসিমুখে; কিন্তু ঘৃণা নাহি সহিবে পরাণে কভু।

নিরুপমা এসে বিজনবিহারীর কাছে দাঁড়ান: শুনেছ?

বিজনবিহারী হাসেন: শুনেছি।

এত শান্ত হয়ে হাসতে গিয়েও ষাট বছর বয়সের চোখ দুটো ছটফট করে ওঠে। চোখের পাতা ভিজে যায়। যেন গলে গিয়েছে দুরন্ত একটা অভিমান।

মুখটাও যে নিতান্ত একটা ছেলেমানুষের মুখ। শিউলিবাড়ির অঘ্রাণের আকাশের দিকে পিপাসিতের মত তাকিয়ে আছেন বিজন-বিহারী। দেখে সন্দেহ হয় নিরুপমার, আর সন্দেহ করতে গিয়ে চোখ দুটোও ঝাপসা হয়ে যায়; যেন ষোল বছর বয়সের বিজুর প্রাণ একটা স্বপ্নের পথে হাঁটা দিয়ে ফিরে চলেছে।

যেন দিগনগরের রাস্তা শেষ হয়ে গেল, ধানক্ষেতের ফুরফুরে হাওয়া পিছনে পড়ে রইল। জলঙ্গীর জল ছলছল করে, একটা একলা নৌকোর বৈঠা ঝুপঝুপ করে, মুচিপাড়ার কুকুর জেগে উঠে ঘুর-ঘুর করে। কেষ্টনগরের আকাশের ঝিকিমিকি তারা নিবেছে। পথের আলো নিবছে। ভোর হয়েছে। ওই তো বাড়িটা। চেঁচিয়ে ডাকছে বিজু: আমি এসেছি ছোড়দা।

খোলা দরজার বাইরে এখনও কুয়াশামাখা অন্ধকার থমকে আছে। শিউলিবাড়ির কোন ঘুম-ভাঙা পাখিও ডেকে ওঠে নি। কিন্তু চোখ মেলে তাকিয়েছে নিরুপমা।

ভোর হয় নি, তবু নিরুপমার চোখ দুটো যেন ভোরের আলোর দুটি চোখ হয়ে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খাটের উপর বিজনবিহারীর পাশে শান্ত হয়ে বসে আছেন নিরুপমা।

টোটাভরা বন্দুকটাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরেছেন বিজন-বিহারী। যেন একটু শান্ত হয়ে, যত্ন নিয়ে, আর অনেক মায়া নিয়ে একটা সুন্দর সাধের কাজ করবার জন্য তৈরি হয়েছে স্বপ্নচারী এক কারিগরের হাত!

কিন্তু বাধা দিল খোলা দরজাটা। পুষ্কর আর সুনন্দা, যেন দুটো ব্যস্ত উদ্বেগ একসঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুকে, আর কালিমাখা জ্বলন্ত বাতিটার দিকে তাঁকিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। থমকে দাঁড়ায় দুটো নিদারুণ বিস্ময়।

ছুটে গিয়ে নিরুপমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে সুনন্দা: আমি কোথাও যাই নি মা। তোমার পায়ে পড়ি মা, ভাল করে তাকিয়ে দেখ, আমি এসেছি। এই তো আমি।

পুষ্কর এগিয়ে এসে বিজনবিহারীর হাত ধরে। বন্দুকটাকে কেড়ে নিয়ে খাটের তলায় ফেলে দেয়।— আপনি এখন ঘরের বাইরে গিয়ে বসুন। আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিন।

সুনন্দা এগিয়ে এসে আলোয়ানটাকে বিজনবিহারীর গায়ে জড়িয়ে দেয়।

বিজনবিহারী আর নিরুপমা, দুজনের দু'জোড়া শান্ত আর অচঞ্চল চোখ যেন ভিন্ন জগতের দুটি মানুষের চোখ। সে চোখে কোন

প্রতিচ্ছায়া পড়ছে না। কিংবা বাইরে থেকে হঠাৎ যেন দুজন নতুন আগন্তুক এসে বিজনবিহারী আর নিরুপমার স্বপ্নের ঘরে ঢুকেছে। বিজনবিহারী আর নিরুপমার ঘুমের চোখ তাই তাদের চিনতে পারছে না।

পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন নিরুপমা। সুনন্দা বলে, তুমি শুয়ে পড় মা, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

বিজনবিহারীও পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পুষ্কর বলে, ভোর হয়ে গিয়েছে। চলুন, বাইরে যাই।

খোলা দরজার দিকে চোখ তুলে বাইরের আকাশটার দিকে একবার তাকালেন বিজনবিহারী। তারপর পুষ্করের সঙ্গেই আস্তে আস্তে হেঁটে বাইরের বারান্দায় এসে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়েন।

পুষ্কর বলে, আমি তবে এখন যাই।

বিজনবিহারী বলেন, এস।

ভোরের পাখি ডাকছে। ঘরের ভিতরে খাটের উপর ক্লান্ত শিশুর মত নিবিড় ঘুমের কোলে যেন ঢলে পড়ে থাকেন নিরুপমা। রান্নাঘরের ভিতর ঠুং-ঠাং করে চা তৈরি করে সুনন্দা। আর, বাইরের বারান্দায় বসে বিজনবিহারীর চোখ দুটো ভোরের আলোর সঙ্গে যেন আস্তে আস্তে জেগে উঠতে আর হেসে উঠতে থাকে।

সকালবেলায় রোদ ঝলমল করে। অনেক দূরে, সিংহানি পাহাড়ের গায়ে যে এক টুকরো সাদা কুয়াশা মাকড়সার জালের মত লেপটে ছিল, সেটাও গলে গেল। রামসিংহাসনের বউ বিন্ধ্যাচলীর হন্তদন্ত উল্লাসের মূর্তিটা হঠাৎ এসে থমকে দাঁড়ায়, বিজনবিহারীকে দেখতে পেয়ে মাথার কাপড় টানে, তার পরেই তিন লাফে ঘরের ভিতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ওঠে: পূজারীবাবুর মেয়ে জয়ন্তী এ কি কথা বলছে দিদি?

ধড়ফড় করে জেগে ওঠেন নিরুপমা: কি?

—পুষ্করের সঙ্গে নন্দুয়া বেটির বিয়ে?

—কবে থেকে তুচ্ছ করেন নি ?

—জানি না। বোধ হয় যেদিন প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকে।

—একথা এতদিন বলেন নি কেন ?

—বলতে ইচ্ছে করে নি।

—আজ বললেন কেন ?

—তুমি জিজ্ঞাসা করলে বলে।

দু'হাত তুলে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে সুনন্দা ; মাটিসাহেবের মেয়ের বুকটার এতক্ষণের সব পাথুরেপনা যেন দুঃসহ একটা বিস্ময়ের কান্না চাপতে গিয়ে গলে গিয়েছে। পুষ্কর দত্ত নয় ; সত্যিই যে ঘুমহারা এক যখের ভালবাসা কথা বলছে। দিন মাস বছর পার হয়েছে, যখের সজাগ চোখ যেন একটা গুপ্তধনের উপর পাহারা রেখেছে। সে গুপ্তধন আজ ধুলো হয়ে যাবে বুঝতে পেরে বিচলিত হয়েছে যখের প্রাণ। বাঃ, মাটিসাহেবের মেয়ের ভাগ্যের উপর আর-এক অদ্ভুত ঠাট্টার আঘাত। গল্পের সেই কাঠুরিয়া মেয়েটার ভাগ্যের মত ; নদীর জলে যখন ডুবে যাচ্ছে মেয়েটা, তখন কোথা থেকে এক রাজপুত্তুর ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ আমি যে এতদিন তোমারই কথা ভেবেছি।

সুনন্দা বলে, কিন্তু আজ আমাকে তুচ্ছ করুন, আপনি যান। আমি যাব না। আমি ফিরে গেলে কারও কোন ভাল হবে না।

—সবারই ভাল হবে। তোমারও ভাল হবে।

—কেমন করে ?

—যেমন করে সব মেয়ের ভাল হয়। বাপ-মার কাছে থাকবে। তারপর···একদিন স্বামীর ঘরে চলে যাবে।

যেন তীব্র একটা ধিক্কার চাপতে গিয়ে শিউরে ওঠে সুনন্দার গলার স্বর ঃ চুপ ! চুপ করুন পুষ্করবাবু। আমাকে কেউ মানুষের মেয়ে বলে মনে করবে না, মন্তর পড়ে হাত ধরবে না, স্ত্রী বলে মেনেও নিতে পারবে না।

—খুব পারবে।

—কেউ পারবে না। আপনিও পারবেন না।

—তুমি বললেই পারব।

—পারবেন না।

হেসে ফেলে পুষ্কর : সত্যি কথাটা কিন্তু বলতে পারছ না সুনন্দা।

—কি কথা ?

—তুমিই পারবে না।

—কেন ?

—তোমার ইচ্ছে নেই। কোনদিন যাকে ভাল লাগে নি, তাকে বিয়ে করতে তোমার ইচ্ছে না হওয়াই তো উচিত।

সুনন্দার গলার কাছে যেন করুণ একটা দীর্ঘশ্বাস আটকে গিয়ে হাঁসফাঁস করে।—কোনদিন ভাল লেগেছিল কি না জানি না, কিন্তু আজ তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি, বেঁচে থাকতে পারলে তোমার কাছেই যেতে চাইতাম।

পুষ্কর দত্তের বুকটাও বোধ হয় চমকে উঠে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের আবেশে টলমল করে উঠেছে। তাই গলার স্বরও নিবিড় হয়ে যায়।

—তবে তো তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। চল সুনন্দা।

—না।

—আমিই তো ডাকছি, চল।

—তোমার ডাক শুনেও আমি যেতে পারব না পুষ্কর। আমাকে ক্ষমা কর।

—কেন ?

—বলতে পারব না। তুমি বুঝে নাও, আর একটি কথাও না বলে চলে যাও।

—আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না।

সুনন্দা যেন নিশ্বাসের সব শব্দ থামিয়ে দিয়ে, বুকের ভিতরে ধুকপুক করছে যে কুণ্ঠার জ্বালাটা, দম বন্ধ করে সেটাকেও নিবিয়ে দিয়ে, আর দু'হাত দিয়ে যেন দুমুঠো কুয়াশাকে খিমচে ধরে নিয়ে, নিথর

হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে—সব বুঝেও এটুকু বুঝতে পারছ না কেন? আমার মরা শরীরটাও যে লুকোতে পারবে না; ময়নাঘরের ডাক্তার যে দেখেই বুঝে ফেলবে আর হেসে ফেলবে, মাটিসাহেবের মেয়ে পেটে একটা কলঙ্ক নিয়ে আত্মহত্যা করেছে?

—কি বললে? পুষ্করের গলাটা কেঁপে ওঠে! পুষ্কর দত্তের প্রশ্নটা যেন ধক্ করে জ্বলে ওঠা একটা ব্যথিত বিস্ময়ের প্রশ্ন।

সুনন্দার চোখ দুটো এইবার অপলক হয়ে, যেন একটা চমৎকার কৌতুকের অন্তিম দেখার জন্য জ্বলজ্বল করতে থাকে। এখনি দেখতে পাবে সুনন্দা, মাটিসাহেবের মেয়েকে একটা ভয়াল মেয়ে-জন্তু বলে মনে করে জওয়ান-ই-বঙ্গালের ভালবাসার মুখরতা কত ভয় পেয়ে কেমনতর বোবা হয়ে যায়; শিউলিবাড়ির কৈসর কেমন করে দু' পা পিছিয়ে গিয়েই ছুটে পালিয়ে যায়।

কিন্তু কেঁপে ওঠে সুনন্দার অপলক চোখ। দু' পা এগিয়ে এসে সুনন্দার একেবারে চোখের কাছে দাঁড়িয়েছে পুষ্কর।—বুঝেছি। সব বুঝেও কিন্তু তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে। বিশ্বাস কর সুনন্দা।

—কি বললে?

—তোমাকে হাত ধরে এখনই টেনে নিয়ে গিয়ে চক্রবর্তী ঠাকুরকে এখনই বলে দিতে ইচ্ছে করছে, দিন ঠিক করুন।

শেষ রাতের কুয়াশাময় আকাশ যেন হঠাৎ জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে। শান্ত ঘুমন্ত শালবন যেন স্বপ্নলোকের মায়াবন। পুষ্করের দিকে একটা হাত এগিয়ে দিয়ে সুনন্দার করুণ মূর্তিটা হঠাৎ বিহ্বল হয়ে টলতে থাকে: তবু ঘেন্না করতে পারলে না?

—না। সুনন্দার হাত ধরে পুষ্কর। কাছে টেনে নেয়। বুকে চেপে ধরে। সুনন্দার শিশিরভেজা মাথাটার উপর হাত বোলাতে থাকে পুষ্কর। একটা আদুরে আকুলতার হাত একটা ফুলের গায়ের ধুলো মুছে দিচ্ছে।

শালবনের মায়া-কুয়াশার গায়ে দুটো আলোর চোখ ভেসে

উঠেছে, সিগন্যালের হাতছানিও ঝুপ করে একটা শব্দ করে সবুজ আলো ভাসিয়েছে। এসে পড়েছে ট্রেণ, এসে পড়েছে একটা কাপুরুষ ইচ্ছার হর্ষ, একটা অপমানের ব্যস্ততা।

সুনন্দা বলে, চল।

পুষ্কর বলে, চল।

—কিন্তু না, ওদিকে নয়, স্টেশন হয়ে যেতে পারব না।

—কেন ?

—ওখানে যে একজন মানুষের ছেলে বসে আছেন, মাটিসাহেবের মেয়ের লাস নিয়ে যাবার জন্য।

হেসে ওঠে পুষ্কর : মোহিতবাবু রাত আটটার মোটরবাসে চলে গিয়েছেন।

—চমৎকার! হেসে ফেলে সুনন্দা। হেসে ফেলেছে একটা দুঃসহ কৌতুকের সমাপ্তি। হেসে ফেলেছে শিউলিবাড়ির হিমেল নীরবতা।

কিন্তু সেই মুহূর্তে মাটিসাহেবের মেয়ের আত্মাটা যেন ছটফটিয়ে ওঠে আর কেঁদে ফেলে। নিশির ডাকে ঘরছাড়া একটা পাগল ভুলের প্রাণ শিউলিবাড়ির একটা ক্ষমার হাত পা বুক আর কোলের কাছে ছুটে গিয়ে লুটিয়ে-পুটিয়ে আদর নেবার জন্য ছটফটিয়ে উঠেছে চোখ মুছে নিয়েই পুষ্করের একটা হাত ধরে টান দেয় সুনন্দা—শিগগির চল।